কাজল মিত্র

দীর প্রকাশন
৬৫/৫ই, বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৩

প্রকাশক ঃ
শশাঙ্ক দাশ
৬৫/৫ই, বাগবাজার স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০০৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
আশ্বিন ১৩৮৮

প্রচ্ছদ ঃ সুবোধ দাশগুপ্ত
অলংকরণ ঃ অমল চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ প্রিন্টোরিয়েন্ট

মুদ্রাকর ঃ
প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০০৬

—উৎসর্গ—

স্বর্গত বাবা-মা'কে

গ্রন্থ-প্রসঙ্গ

কলকাতার ইতিহাস নিয়ে গত কয়েক মাসের ব্যবধানে কয়েকখানি বই প্রকাশিত হয়েছে—অবশ্য এর মধ্যে দু'চারটি পুরণো বই-এর পুনঃমুদ্রণ অথবা পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের সঙ্কলন। পাঠকমহলে কলকাতা সম্পর্কে জানাশোনার আগ্রহ বেড়েছে—এটা অনুমান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে নিছক গবেষণামূলক প্রচেষ্টার পরিচয় সম্প্রতিকালে পাওয়া গেছে—কলকাতার urban history, পরিসংখ্যানের সাহায্যে কলকাতার সমাজ-বিবর্তন, ভৌগোলিক প্রসার, অর্থনীতিক জীবনের গতিপ্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার মাধ্যমে। এর ফলে কলকাতার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্র নিঃসন্দেহে প্রসারিত হয়েছে। কলকাতার অধিবাসী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়েও গবেষণার কাজ এগিয়ে গেছে। কলকাতার সমাজ-জীবনের নানাদিকও গবেষকরা তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তুরূপে বেছে নিয়েছেন। এ ধরণের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ। কলকাতা এবং নগর জীবনের ইতিহাস শুধু ইতিহাসবিদ্‌দের গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—এটাও আশার কথা। সাহিত্যিক, নৃতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, স্থপতি এবং প্রযুক্তিবিদ্যাবিশারদের দৃষ্টি ও এই শহরটির নগর-পরিচয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে—এটি আরও আশাপ্রদ বিষয়। বিদেশী গবেষকরাও এ বিষয়ে রীতিমত আগ্রহী। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক ছাড়াও ইংরেজী বা ভারতীয় কোন ভাষা যাদের মাতৃভাষা নয় এমনি গবেষকরাও কলকাতার ইতিহাস চর্চার কাজে হাত বাড়িয়েছেন, এটাও শহরবাসীদের কাছে তো বটেই, ইতিহাসানুরাগীদের কাছেও রীতিমতো শ্রুতিসুখকর সংবাদ।

প্রচলিত অর্থে গবেষণাসমৃদ্ধ হয়ে উঠুক কলকাতার ইতিহাস এটা সকলেরই কাম্য। কিন্তু কলকাতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহের

সবটুকু গবেষকরা মেটাতে পারবেন এটা আশা করা বোধহয় আশার সীমাকে লঙ্ঘন করার সামিল হবে। তাই কলকাতা সম্পর্কে আগ্রহ আর অনুসন্ধিৎসা মেটাতে এগিয়ে এসেছেন সাহিত্য ও ইতিহাসের পসারীরা। কলকাতা নিয়ে ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে ডিরেক্টরী বা গাইডবুক এমনি ধরণের বই যেমন রচিত হয়েছে একাধিক সংখ্যায়, তেমনই কলকাতা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'টুকিটাকি', 'সমাচার', 'কড়চা', 'কথাচিত্র' পাঠক সমাজের কাছে লাভ করেছে স্বতোৎসারিত সমাদর। তবু যে সব কথা বলা হয় নি অথবা পুরোপুরি বলা হয় নি অথচ যার সম্পর্কে বয়স, সম্প্রদায় এবং শিক্ষান্তর নির্বিশেষে কলকাতা প্রেমীদের মনে অদম্য কুতূহল সে সব বিষয় নিয়ে নতুন লেখার প্রয়োজন এখন অনুভূত হচ্ছে। এই প্রয়োজন-অনুভূতিতে সাড়া দিয়েই শ্রীকাজল মিত্র উপস্থাপিত করেছেন কালে কালে কলকাতার কাহিনী। কালভেদে কলকাতার রূপান্তরের কাহিনীর ইতিহাস প্রণয়ণ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। শহর কলকাতার অঙ্গীভূত এমনি কয়েকটি বিষয় যা প্রতিদিন আমাদের চোখে পড়ে, যাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নিত্যদিনের এবং যাদের স্থান নেহাৎ অন্তরঙ্গ মহলে অথচ যাদের গোড়ার কথা আমাদের কাছে অজানা, সেই সব বিষয়ের পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন নিপুণ লেখনীর মাধ্যমে। সবই সাদা-মাটা বিষয়বস্তু, ইতিহাসের অভিজাত পংক্তিতে যাদের দেখতে পাওয়া নিয়মের ব্যতিক্রম—সেই সব বিষয়ের অবতারণা করেছেন গ্রন্থকার। ইংরেজদের লেখা ডায়েরী, জার্ণাল, আত্মচরিত, ভ্রমনবৃত্তান্ত এসবের উপর আমরা বহুদিন পর্যন্ত নির্ভর করেছি বেশী মাত্রায়। দেশীয় উপকরণ যথাযোগ্য স্বীকৃতি পায়নি। শ্রীমিত্র এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাদের দৈন্য বহুল পরিমাণে লাঘব করেছেন। তিনি যে সব উপাদান উপকরণের সাহায্য নিয়েছেন তার মধ্যে দেশীয় সংবাদপত্র অন্যতম। এটি একটি সুলক্ষণ।

আজকের কলকাতা সম্পর্কে আমাদের ভয় ভাবনার অন্ত নেই। শহরের সমস্যা কতো ব্যাপক, কতো গভীর তা জানার জন্য কোন

সমীক্ষার প্রয়োজন হয় না। দু'চার ঘন্টা শহরের যে কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ঘুরে-আসা বাইরের আগন্তুকের কাছেও সমস্যার চিত্রটি অনিবার্য-রূপেই ধরা দেবে। শহরের বুকে একদিকে 'মেট্রোপলিটন জৌলুসের সদম্ভ প্রকাশ, অন্যদিকে 'কলোনিয়াল' অতীতের ক্রমিক চিহ্নলোপের অশালীন প্রয়াস—তবু কলকাতা এখনও ধুঁকছে কলকাতাতেই। তিলোত্তমা কলকাতা এখনও আমাদের স্বপ্নসহচরী, সুস্থ সভ্য নগরজীবন এখন পর্যন্ত কল্পনা বিলাস। ইতিহাসের দাবিতে পুরনোকে যথাসম্ভব সংরক্ষনের প্রয়াস তো নয়ই, তার প্রয়োজনও আমাদের কাছে স্বীকৃতিধন্য হওয়ার অপেক্ষায়। এহেন শহরের অস্তিত্বের অনুপরমাণুর সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে এমনি কয়েকটি বিষয়বস্তু যা কালের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে তাদের গোড়ার কথাই শুধু লেখক উপস্থাপিত করেননি, সেই গোড়ার মূহূর্ত থেকে আজকের দিনে প্রসারিত তাদের কাহিনী তিনি তুলে ধরেছেন অসাধারণ মমতায়। অতীত আর বর্তমান দুটি রূপের পরিচয়ই পাওয়া যাবে কালে কালে কলকাতায়।

গ্রন্থকার শ্রীকাজল মিত্র ইতিপূর্বে আমাদের কাছে পরিচিত ছিলেন প্রবন্ধকার হিসেবে; গ্রন্থকাররূপে তাঁর এই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে কলকাতাকে কেন্দ্র করে—এ জন্য তিনি অভিনন্দনের পাত্র।

৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ — নিশীথরঞ্জন রায়

কেন কলকাতা

সুতানুটির ঘাটে কোন এক সকালে এসে নৌকো ভেড়াবার পর কলকাতায় ইংরেজদের প্রথম পুরুষ জোব চার্নক ধরেই নিয়েছিলেন কলকাতাই হবে ইংরেজদের সৌভাগ্যের প্রতীক। তাই ইংরেজরা এই কলকাতাকেই বেছে নিয়েছিল সেরা জায়গা হিসেবে। তাদের নিজেদের স্বার্থেই তারা সমস্ত সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করেছিল এখানে। প্রথম জাহাজ এনে তারা যেমন ব্যবসার সুবিধে করেছিল তেমনি ট্রেন চলার ফলে তাদের যাতায়াতের সমস্যা মিটেছিল।

স্কুল কলেজ মাদ্রাসা এ সবই তৈরি হয়েছিল তাদের নিজেদের কাজের সুবিধের জন্যে, এদেশের মানুষদের সুবিধের জন্যে নয়। ইংরেজদের স্তুতি গান করে তখনকার কলকাতার বড়লোক বাঙালীবাবুরা সায়েব মাহাত্ম্য প্রচারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তাদের প্রচারের ফলেই স্বল্পবিত্ত নিরীহ কলকাতাবাসী ভেবেছিল ইংরেজরা সত্যিই মহানুভব। আর এই ধারণাটাই ভুলিয়ে দিয়েছিল পরাধীনতার কথা। এ কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে কলকাতার বাবুরা পেয়েছিলেন রাজামহারাজা, নিদেন পক্ষে রায় বাহাদুর রায় সাহেবের তকমা। বাবুদের প্রচারে ইংরেজরা লাভবান হয়েছিল। তাই এখনো অনেক বাঙালীর মুখে আক্ষেপ শোনা যায়, 'আমাদের ইংরেজ আমল থাকলে এমনটা হত না।'

নেটিভদের দুঃখে বিগলিত প্রাণ ইংরেজরা কলকাতাকে ভিত্তি করে তাদের লক্ষ্মীর আরাধনা শুরু করে। তাই কলকাতার সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে তাদের কার্পণ্য ছিল না। বোতাম টিপলেই আলো জ্বলবার ব্যবস্থা যেমন তারা করেছিল তেমনি এই কলকাতার আদিপর্বে প্রথম পাকা গাঁথুনির পত্তন হয়েছিল কোম্পানির একান্ত অনুগত সেবক জোব চার্নকের সমাধি দিয়ে। তাই গ্রন্থের আরম্ভ সেই সমাধি দিয়ে।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁদের অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি তাঁরা হলেন শ্রদ্ধেয় নিশীথরঞ্জন রায়, অমিতাভ চৌধুরী আর ধীরেন সেন। বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য বই দিয়ে সাহায্য করেছেন পরিতোষ ভট্টাচার্য আর শংকর শীল। প্রুফ দেখার কাজে সহযোগিতা করেছেন প্রতিমা মিত্র। সবচেয়ে বড় সাহায্য পেয়েছি বন্ধু অরূপ মজুমদারের কাছে। সেই সাহায্য হল অনুপ্রেরণা।

কাজল মিত্র

সূচীপত্র

কবর

শুরুটা একটু অদ্ভুত ধরনের। জন্মের আগেই মৃত্যুর খবর। বোধনের আগেই বিসর্জন। অন্তত, কলকাতার গড়ে ওঠার কাহিনীর গোড়ার কথাতে কবরের খবরে তাই মনে হতে পারে। কিন্তু ইংরেজরা কলকাতায় এসেছিল যেমন ব্যবসা করতে, তেমনি আর পাঁচটা মানুষের মত স্বাভাবিক ভাবেই তারাও জন্ম-মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। বঙ্গে এলে কপালও সঙ্গে আসে। তাই কলকাতার মাটির নীচে প্রথমাবধি অনেক সায়েবকেই শেষ শয্যা নিতে হয়েছে। আর তা হয়েছে একেবারে কলকাতার আদি পর্ব থেকে। সায়েবী কলকাতার প্রথম নিদর্শন তাই কবর খানা।

সেণ্ট জন গীর্জার প্রাঙ্গণে কলকাতার জনক জোব চার্নকের সমাধিকে হাইড সাহেব বলেছেন—সম্ভবত এইটিই কলকাতার প্রাচীনতম পাকা গাঁথুনি। অবশ্য আর্মেনিয়ান গীর্জার প্রাঙ্গণে শ্রীমতী আর সুকিয়াসের সমাধি ফলকে ১৬৩০ সালের উল্লেখ আছে। জোব চার্নকের সমাধিতে খোদিত আছে ১৬৯২-৯৩ সাল। চার্নকের মেয়ে মেরি আয়ার ও ক্যাথারিনের সমাধি ফলকে ১৬৯৬-৯৭ আর ১৭০০-০১ সালের উল্লেখ দেখা যায়। আর্মেনিয়ান গীর্জার শ্রীমতী সুকিয়াসের সমাধির কথা বাদ দিলে কলকাতায় সাহেবদের সমাধি হিসেবে সেণ্ট জন গীর্জা প্রাঙ্গণের সমাধিস্থলকেই কলকাতার সাহেবদের প্রাচীনতম সমাধিক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়। সেণ্ট জন গীর্জার সমাধি ক্ষেত্রে আছে

জোব চার্নক ছাড়া আদি কলকাতার ডাকসাইটে ডাক্তার উইলিয়াম হ্যামিল্টনের সমাধি। সাল ১৭১৭। সার্জন হ্যামিল্টন শুধু চিকিৎসকই ছিলেন না, রাজনৈতিক ডাক্তারীটাও ভাল মত বুঝতেন। দিল্লির দরবারে তাঁর ডাক্তারীর সুনামেব সুযোগ নিয়ে তিনি বৃটিশ বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করার কাজটাও হাসিল করে নেন।

হ্যামিল্টন ছাড়া এখানে আছে পলাশীযুদ্ধের অন্যতম নায়ক অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের সমাধি। ওয়াটসন কলকাতার মহামারীতে মারা যান। সেন্ট জন গীর্জার জমির ওপরেই ছিল কলকাতার ইংরেজদের আদি গোরস্থান। এর পূব দিকে ছিল বারুদখানা, মাঝখানে ছিল একটা গভীর খাল। পরে গীর্জা তৈরীর সময় কবরখানার ভাঙাচোরা সমাধিস্তম্ভগুলো ভেঙে ফেলে পাথরের ফলকগুলো এনে গীর্জার পাশে সমাধিস্থলের প্রাঙ্গনে সাজিয়ে রাখা হয়।

মিউনিসিপ্যালিটি

কলকাতা তখন কলকাতা ছিলনা। জলে জঙ্গলে ভরা একটা ভূখণ্ড। যত্রতত্র আগাছা আর খাল বিল। অসহ্য আবহাওয়া। এরই মধ্যে সায়েবরা এসে পত্তন করল। ১৬৯০ সালের চব্বিশে আগস্ট সুতানটি গোবিন্দপুর আর কলকাতাকে জলের দরে কিনে নিয়ে সায়েবরা এখানে ওখানে সুবিধে মত কাদামাটি আর বাশের বেড়া দিয়ে ঘর তুলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তারা উপলব্ধি করল এখানে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা ঠিকমত না করতে পারলে নগর গড়ে তোলার স্বপ্ন কোন দিনই বাস্তবে পরিণত হবে না। তাই ১৬৯০ সালেই কোম্পানি একটা আদেশ দিয়ে জানিয়ে দেয়, কোম্পানির দখলী আর পতিত জমি আর জঙ্গল সাফ করে যে কেউ তার ইচ্ছেমত ঘর বাড়ি তৈরী করতে পারবে।

সায়েবরা কিন্তু জানত যে এসব কাজ করতে গেলে টাকা চাই। তাই তারা ১৭০৪ সালে ঠিক করল দেশীয় লোকদের কাছ থেকে জরিমানা বাবদ আদায় করা টাকা দিয়ে শহরের ভেতর আর আশ-পাশের খানা-ডোবা ভরাট করে নর্দমা তৈরি করবে। এটাই হল কলকাতার পৌর সংস্থার আদি কথা।

কোন লোক যাতে তার খুশিমত যেখানে সেখানে বাড়ি তৈরি বা পুকুর কাটতে না পারে তার জন্যে ১৭০৭ সালে কেল্লার দরজায় একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।

১৭১০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ভেতর আর আশপাশের গাছপালা কাটাবার আর জল নিকাশের ব্যবস্থার জন্যে আদেশ প্রচার করা হয়।

পৌর সংস্থা বা মিউনিসিপ্যালিটি ধাঁচের সংস্থা গড়ে ওঠে ১৭২০ সালে। শহরের স্বাস্থ্যের উন্নতিই ছিল মিউনিসিপ্যালিটির লক্ষ্য।

মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান ছিলেন মেয়র। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে থাকতেন ৯ জন অলডার ম্যান। হলওয়েল ছিলেন সে সময়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট। ১৭৪৯ সালে কলকাতায় নর্দমা কাটানোর জন্যে কিছু টাকা মঞ্জুব কবা হয়। ১৭৫৩ সালে কলকাতাব চারদিকে

House Rate Bill—3rd QUARTER OF 1875.

Reg No

or Owner, Dr.

Rs As P

Calcutta, 1875.

Vice-Chairman

Collector
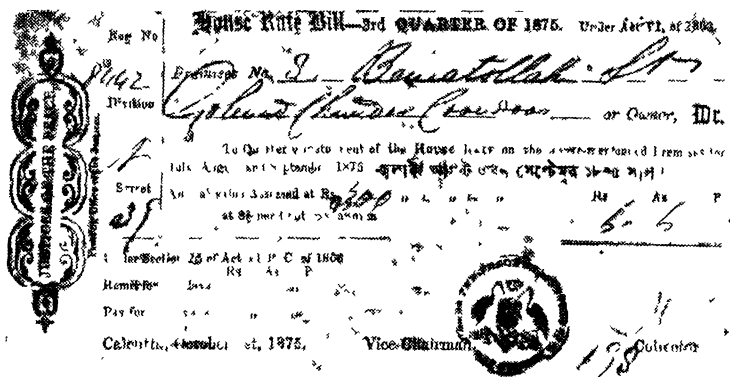
১৮৭৫ সালের কলকাতার বাড়ির ট্যাক্সের বিল

নর্দমার ব্যবস্থার কথা জানা যায়। ১৭৫৫ সালে ট্যাঙ্কস্কোয়ার বা লাল দীঘিতে ঘোড়া স্নান করানো নিষিদ্ধ কবে নোটিশ দেওয়া হয়। ১৭৫৫-৫৬ সালে কলকাতায় পাকা বাড়ি ছিল ৪৯৮টা। কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ছিল ১৪৪৫০। ১৭৫৭ সালে কুমোরটুলি অঞ্চলে এক কাঠা জমির দাম ছিল ১১ টাকা।

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেও এখনকার মত মিউনিসিপ্যালিটির অস্তিত্ব ছিল না। সে সময় শহরের জঞ্জাল সাফ করার বিভাগ ছিল পুলিশ বিভাগের অধীন। নেটিভ টাউনে প্রত্যেক থানায় দুখানা করে ময়লা ফেলার গাড়ি থাকত। ময়লা সাফ করার বিভাগের নাম ছিল স্ক্যাভেঞ্জার অফিস।

১৮২০ সাল থেকে শহরে পাকা রাস্তা তৈরি শুরু হয়। এর জন্যে বার্ষিক ব্যয় ছিল পঁচিশ হাজার টাকা।

গীর্জা

দেখতে দেখতে আঠার বছর হয়ে গেছে কলকাতার বয়স। কিন্তু এতদিনেও ইংরেজদের সাধনভজনের একটা উপযুক্ত জায়গা তৈরি হয়নি। কলকাতার সাহেবরা ১৭০৯ সালে বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে আর তার ওপর কোম্পানির দেওয়া একহাজার টাকা দিয়ে গড়ে তুলল সেন্ট অ্যান গীর্জা। রাইটার্স বিল্ডিংসের পশ্চিম কোণে ছিল এই গীর্জা। ১৭০৯ সালের ৫ জুন লণ্ডন থেকে এলেন বিশপের প্রতিনিধি। কলকাতার সেন্ট অ্যান গীর্জা প্রভু যীশুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হল। তৈরি হল কলকাতার প্রথম খৃষ্টান ভজনালয়। এই গীর্জার জমি দান করেছিল কোম্পানি। সেন্ট অ্যান গীর্জাকে ফোর্ট উইলিয়ম গীর্জাও বলা হত। এর আগে পুরনো কেল্লার মধ্যে অবশ্য একটা উপাসনালয় ছিল। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরী আর উৎসর্গ করা গীর্জা হল সেন্ট অ্যান গীর্জা।

১৭৩৭ সালে কলকাতায় যে প্রলয়ংকর ঝড় হয় তাতে সেন্ট অ্যান গীর্জার চূড়া সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা অভিযানের সময় গীর্জাটি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর মুর্গীহাটার পর্তুগীজদের গীর্জা ইংরেজরা উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। ১৭৬০ সালে পুরনো কেল্লার মধ্যে তৈরি হয় সেন্ট জন গীর্জা। তখন পর্তুগীজদের গীর্জাটি ইংরেজরা ছেড়ে দেয়। ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত এটিই ছিল প্রেসিডেন্সি গীর্জা। মিডলটন, হিবার, জেমস্, টার্নার, আর উইলসন এই গীর্জাতেই বিশপের পদলাভ করেছিলেন।

১৭৮৭ সালে পুরনো বারুদখানা আর পুরনো গোরস্থানের উপর তৈরি হয় সেন্ট জন গীর্জা। ঐ বছর ২৪ জুন লর্ড কর্ণওয়ালিস এই

গীর্জার উদ্‌বোধন করেন। ১৭৮৩ সালে এই গীর্জার জন্যে একটা কমিটি তৈরি হয়েছিল। সেই কমিটির প্রথম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। সেই দিনই জনসাধারণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ৩৫৯৫০ টাকা পাওয়া যায়। লটারি থেকে পাওয়া যায় ২৫৫৯২ টাকা। বাকি টাকা সংগ্রহ করা হয় চাঁদা তুলে। গীর্জা তৈরির জন্যে মোট খরচ হয়েছিল এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। মহারাজা নবকৃষ্ণ গীর্জার জন্যে জমি দান করেন। গীর্জার নক্সা তৈরি করেছিলেন লেফটেন্যান্ট জেমস্ অ্যাগ। চুনার আর গৌড় থেকে পাথর আনিয়ে এই গীর্জায় লাগানো হয়েছিল। সেই জন্যে লোকে একে পাথুরে গীর্জাও বলত। সেকালের স্বনামধন্য চিত্রকর জোফানি সেণ্ট জন গীর্জার বেদীর জন্যে ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। ছবিটির নাম 'লাস্ট সাপার'। সেণ্ট জন গীর্জার ভেতরের সমাধিস্থলে আছে জব চার্নক, ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিলটন, ভাইস অ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন প্রমুখের সমাধি।

আদালত

"জিলা কোমিল্লার জজ শ্রীযুত জন হেজ সাহেবের উপরে এক খুনী মোকদ্দমা হইয়াছিল। ৮ এপ্রিল সোমবারে সুপ্রীম কোর্টে তাহার আদালত হইল। তাহাতে ফৈরাদীর সাক্ষিরা এইরূপ ক'হিল যে ত্রিপুবাব এক জমিদার প্রতাপনারায়ণ দাসকে মোকাম কোমিল্লাতে থাকিবাব কারণ জজ সাহেব আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং সাহেব কর্ম্মক্রমে গত জুলাই মাসে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন এই অবকাশে ঐ জমিদার আপন পুত্রের অস্সুস্থতা সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাটী গিয়াছিল। এবং সে পুত্র মবিল তথাপি জজ সাহেবের কোমিল্লাতে পঁহুছিবার দুইদিন অগ্রে ঐ জমীদার কোমিল্লাতে পঁহুছিল। পরে সাহেব শুনিলেন যে ঐ জমীদার আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া বাটী গিয়াছিল ইহাতে জমীদারকে ধরিয়া আপন নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে যে পেয়াদারা আনিতে গিয়াছিল তাহারা জমীদারকে হঁাটাইয়া আনিতে স্থির করিল কিন্তু জমীদার ঐ পেয়াদারদিগকে কিঞ্চিৎ ঘুস দিয়া সোয়ারিতে উঠিয়া কতক দূর আসিয়া নিকট হইতে হঁাটিয়া সাহেবের নিকটে আইল। সাহেব কোন তজবীজ না করিয়া আগতমাত্র হারামজাদা গালি দিয়া ২০ বেত মারিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে জমীদার কহিল যে আমি এমত দুষ্কর্ম করিনাই যে আমার অসম্ভ্রম করেন যদি করেন তবে আমি বাঁচিব না এবং জরিপানা যে করিতে চাহেন তাহা দিতে মজুত আছি। সাহেব তাহা না শুনিয়া তাহাকে দশ বেত মারিলেন তাহাতে সে জমীদার মূর্চ্ছাপন্ন হইয় ভূমিতে পড়িল পুনর্বার উঠাইয়া আর দশ বেত মারিলেন পরে

দুই চাপরাসী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কারাগারের মধ্যে লইল এবং তাহার নিকটে তাহার চাকর কিম্বা বন্ধু লোককে যাইতে দিলেন না তৎপ্রযুক্ত সে মারির চিকিৎসাও হইল না আহারাদিও পাইল না তৃতীয় দিবসে তাহার মৃত্যু হইল।”

১৮২২ সালের ২০ এপ্রিল সমাচার দর্পনের পাতায় সেকালের কলকাতার সাহেবদের আদালতে বিচার প্রহসনের জ্বলন্ত উদাহরণ লেখা আছে এইভাবে।

নামমাত্র মূল্যে তিনখানা গ্রাম কিনে নিয়ে কলকাতা গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের মনে কিন্তু একটা চিন্তা সব সময় ঘুরত। সেটা হল আদালত স্থাপন করা। আধুনিক বিচার ব্যবস্থার প্রাজ্ঞ প্রপিতামহ বৃটিশ সরকার বিচার না করে কাউকে সাজা দেবার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। তাই কোর্ট কাছারি তৈরি করে দোষীদের সাজা দেবার একটা পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করবার কথা নিয়ে কোম্পানির কর্তারা ভাবতে লাগলেন।

রাজকীয় সনদ অনুসারে ১৭২৬ সালে তৈরি হল প্রথম আদালত। নাম মেয়রস কোর্ট। একজন মেয়র আর ৯ জন সহকারী বা অলডারম্যানকে নিয়ে তৈরি আদালতে বিচার চলত। এই আদালতকে কোর্ট অব রেকর্ডও বলা হত। এখানে প্রধানত ইংরেজদের বিষয়-আশয় সংক্রান্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার শুনানী হত। এর ওপরে ছিল কোর্ট অব আপীল। সেখানে গভর্নর আর কাউন্সিলের সভ্যরা বিচার করতেন।

বড় বড় ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির জন্যে তখন কলকাতায় কোর্ট অব কোয়ার্টার সেসনস্ নামে আর একটা আদালত ছিল। এখানে শুধুমাত্র গভর্ণর বিচার করতেন।

১৭৫৩ সালে কোর্ট অব রিকোয়েস্ট নামে একটা আদালত খোলা হয়েছিল। চব্বিশজন কমিশনার এখানে বিচার করতেন। প্রতি

বৃহস্পতিবার আদালত বসত। সামান্য কুড়ি পঁচিশ টাকা দেনা-পাওনার বিচার এই আদালতে হত।

মেয়রস্ কোর্টের জন্যে সরকার ড্যালহৌসি স্কোয়ারের (তখনকার ট্যাংক স্কোয়ার, বর্তমানে বি-বা-দী বাগ) উত্তর-পূর্ব কোণে একটা বাড়ি
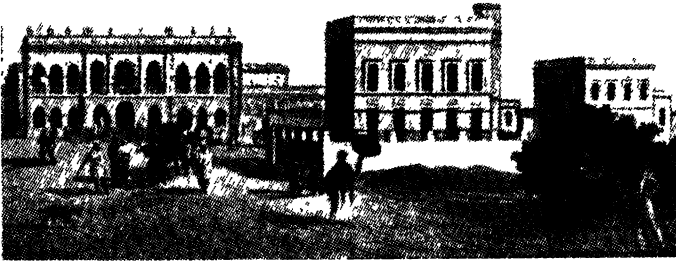
পুরনো আদালত

ভাড়া নেন। মেয়রস্ কোর্টই পুরনো আদালত বা ওল্ড কোর্ট হিসেবে পরিচিত আর সেই নাম থেকেই আজও রাস্তার নাম ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট।

১৭৭৪ সালে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হলে মেয়রস্ কোর্ট উঠে যায়। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের নিজস্ব বাড়ি না থাকায় এই বাড়িতেই আদালত বসত। মহারাজা নন্দকুমারের ঐতিহাসিক বিচার হয় পুরনো মেয়রস্ কোর্টের বাড়িতেই। বিচার চলেছিল ১৭৭৫ সালের ৮ জুন থেকে ১৬ জুন। নন্দকুমারের ফাঁসি হয় ১৭৭৫-এর ৫ আগস্ট। মেয়রস্ কোর্টের বাড়ি ১৮১৫ সালে ভেঙে ফেলে সেখানে তৈরি হয় সেণ্ট এণ্ড্রুর গীর্জা। ১৭৮০ সালে বর্তমান হাইকোর্টের জমিতে সুপ্রীম কোর্টের নতুন বাড়ি হয়। সুপ্রীম কোর্টের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের লোকজনকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করা। নন্দকুমারের তথাকথিত অপরাধের বিচার দেখে তো সে কথাই মনে হয়।

১৭৭৪ সালের ২৩ এপ্রিল সুপ্রীম কোর্ট খোলা হয়। প্রধান বিচারপতি ছিলেন এলিজা ইম্পে। পিউনি জজ ছিলেন রবার্ট চেম্বার্স, স্টিফেন সীজার লেমাস্ট্রে আর জন হাইড। প্রধান বিচারপতির মাইনে ছিল বছরে আট হাজার পাউণ্ড। পিউনি জজদের মাইনে ছিল ছ' হাজার পাউণ্ড। প্রথম যেদিন সুপ্রীম কোর্ট খোলা হয় সেদিন মাত্র একজন ব্যারিস্টার উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নাম টমাস ফারার।

১৮৬২ সালে হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার বার্নস পীকক। ১৮৬৪ সালে সুপ্রীম কোর্টের পুরনো বাড়ি ভেঙে হাইকোর্টের নতুন বাড়ি তৈরি হয়। ১৮৬৬ সালে ব্যারিস্টার হিসেবে ভর্তি হন জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। তিনিই প্রথম দেশীয় ব্যারিস্টার। আগে আদালতে যারা মামলা করত তারা নিজেরাই নিজেদের হয়ে ওকালতি করত। ১৭৯৩ সাল থেকে প্রথম ওকালতি আরম্ভ হয়।

সেকালে লঘু পাপে গুরুদণ্ড ছিল বিচারের বৈশিষ্ট্য। ১৮০০ সালে ব্রজমোহন ঘড়িওয়ালাকে সামান্য পঁচিশ টাকা দামের ঘড়ি চুরির দায়ে ফাঁসি যেতে হয়েছিল। ১৮০২ সালে বৈজু মশালচিকেও চুরির অপরাধে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হয়। এছাড়া চাবুকের ব্যবস্থা ছিল। চোর ডাকাতদের গলায় ছ্যাঁকা দিয়ে গঙ্গা পার করে দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। অপরাধীদের হাত পুড়িয়ে দেওয়া হত। ভুড়ুম্ ঠোকার ব্যবস্থাও একটা কঠিন শাস্তি হিসেবে প্রচলিত ছিল। একটা কাঠের বাক্সের ভেতর অপরাধীর পা ঢুকিয়ে আটকে দিয়ে তাকে মারধর করা হত। এর নামই ছিল ভুড়ুম্ ঠোকা। ১৮১৬ সালে আইন করে এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়।

মন্দির-মসজিদ

কলকাতার প্রথম মন্দির একটা বিতর্কিত বিষয়। তবে কলকাতা বা কলিকাতা নামের সঙ্গে যে কালীর নাম যুক্ত সে কথা বিদেশী ঐতিহাসিকেরাও তাঁদের গবেষণায় স্বীকার করেছেন। বিপ্রদাসের 'মনসার ভাসানে' (১৫৪৫) কালীঘাটে দেবী পূজার কথা পাওয়া যায়।

কালী আগে ছিলেন কলকাতায়। পরে গেছেন কালীঘাটে। কবে গেছেন সেই সন তারিখ পাওয়া না গেলেও প্রবাদবাক্য বলে এখনকার পানপোস্তার উত্তর দিকে দেবীর মন্দির আর পাকা ঘাট ছিল। সেই বাঁধান ঘাট থেকেই পাথুরিয়াঘাটা নামের উৎপত্তি। দরমাহাটা স্ট্রীট পানপোস্তার উত্তরে। তাহলে ধরে নেওয়া যায় দেবীর মন্দির আগে সেখানেই ছিল। কাপালিকেরা সেখান থেকে দেবীকে নিয়ে যায় কালীঘাটে। কারণ কী তা জানা যায় না। তবে এটুকু ধরে নেওয়া যায় যে, কলকাতার উত্তরাঞ্চলে তখন জনবসতি বেড়ে উঠছিল। কাপালিকেরা দেবী কালীর সামনে নরবলি দিত। তাই সেই বলিদানের সুবিধের জন্যই তারা বেছে নিয়েছিল তখনকার ঘনজঙ্গলে ভরা কালীঘাট অঞ্চলকে। কালী কলকাতা থেকে কালীঘাটে স্থানান্তরিত হবার পর সেকালের চিৎপুরের রাস্তার নাম হয়েছিল 'রোড টু কালীঘাট।' বেহালা থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যবর্তী জায়গাকে বলা হত কালীক্ষেত্র। কবিকঙ্কনের চণ্ডীতে (১৫৮৭—৯২) কালীঘাটের নাম পাওয়া গেলেও কালীক্ষেত্র বা দেবী কালীর উল্লেখ দেখা যায় না। দিল্লির পাঠান আমলে রচিত কালীক্ষেত্র দীপিকায় কালীঘাট অঞ্চলকে 'ভীষণ জঙ্গল, কচু ও বেতগুল্মাদি পূর্ণ স্থান' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুরাণের বর্ণনায় জানা যায় দক্ষযজ্ঞের পর সতীর ডান পায়ের আঙুল

ছিন্ন হয়ে যে জায়গায় পড়েছিল সেই জায়গাই একান্ন পীঠের একটি পীঠ (পীঠ মালা)। বেহালা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ষোড়শ যোজন অঞ্চলই এই পীঠের অন্তর্ভুক্ত। ১৭৪০ সালের গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনীতেও কালীঘাটের উল্লেখ দেখা যায়।

কালীঘাটের বর্তমান মন্দির উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে তৈরী। মন্দিরের ইতিহাসও বিচিত্র। উত্তর কলকাতার দুই ধনী বাঙালী রাজা নবকৃষ্ণ আর চূড়ামণি দত্ত ছিলেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। চূড়ামণি দত্ত চব্বিশ পবগনার সাঁইবনা থেকে কলকাতায় আসেন সিরাজদ্দৌল্লার কলকাতা অভিযানের পরে। চূড়ামণির বিশাল বাড়ি ছিল এখনকার গ্রে স্ট্রীটের কাছে। তখন এই অঞ্চলকে বলা হত 'বালাখানা'। চূড়ামণির শ্রাদ্ধে নবকৃষ্ণ কলকাতার বামুন-কায়েতদের যেতে বারণ করে দেন। পয়সার জোরে নবকৃষ্ণ তখন সমাজপতি। তাই বামুন কায়েতরা নবকৃষ্ণের কথা মেনে নিয়ে চূড়ামণির শ্রাদ্ধে অনুপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। চূড়ামণির ছেলে কালীপ্রসাদ এই সমস্যা সমাধানের জন্যে পরামর্শ চাইলেন রামদুলাল সরকারের কাছে। রামদুলালের সাহায্যে বঁড়িষার সাবর্ন চৌধুবী সন্তোষ রায়কে বলে সেখানকার বামুন-কায়েতদের আনিয়ে পিতৃদায় মুক্ত হলেন কালীপ্রসাদ। দুই বড়লোকের এই লড়াইকে বলা হয় 'কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা' বা 'কালীপ্রসাদী কেচ্ছা।'

সন্তোষ রায় কালীপ্রসাদকে অনুরোধ করেন কালীঘাটের বর্তমান মন্দির তৈরি করে দিতে। কালীপ্রসাদ তাতে রাজি হয়ে পঁচিশ হাজার টাকা দেন মন্দির তৈরির কাজে। সন্তোষ রায় মন্দির তৈরি শুরু করেন। তাঁর ছেলে মন্দির সম্পূর্ণ করেন ১৮০৯ সালে। ভূ-কৈলাসের দেওয়ান গোকুল চন্দ্র ঘোষাল কালীর চারটি রূপোর হাত করে দেন। পরে কালীচরণ মল্লিক রূপোর হাতের জায়গায় গড়ে দেন সোনার হাত। পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ দেন সোনার জিভ। বেলেঘাটার চালের ব্যবসায়ী রামনারায়ণ সরকার দেন সোনার মুকুট। চড়ক ডাঙার

রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছিলেন চারটি সোনার কঙ্কন আর নেপালের প্রধান সেনাপতি স্যার জঙ্গ বাহাদুর দিয়েছিলেন সোনার ছাতা। ১৮৩৫ সালে আন্দুলের জমিদার কাশীনাথ রায় তৈরি করে দেন নাট মন্দির। কালীঘাট মন্দিরের সঙ্গে জায়গা আছে ৫৯৫ বিঘা। এই মন্দির আটচালা মন্দিবের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং আয়তনে বৃহত্তম (২৫½×৪৬ ফুট+৯০ ফুট উঁচু) (বিনয় ঘোষ)। মন্দিরের সেবায়েতরা রাঢ়ি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

চিৎপুর কলকাতার সবচেয়ে পুরানো রাস্তা। চিৎপুরের নামের সঙ্গে চিত্রেশ্বরী মন্দির আর চিতে ডাকাতের নাম যুক্ত। চিতে ডাকাতই কোন এক সময় প্রতিষ্ঠা করেছিল কালীর। সে সময়ের কথা জানা যায় না। তবে অষ্টাদশ শতকের আশির দশকেও যে এখানে নরবলি হত তার উল্লেখ আছে কাগজপত্রে। চিত্রেশ্বরী বা চিত্তেশ্বরীর মন্দিরও কলকাতার আদি মন্দির।

॥ মসজিদ ॥

কলকাতায় মুসলমানদের উপাসনার প্রাচীনতম স্থান কোনটি তা জানা যায় না। কলকাতায় নানা সময়ে মুসলমানদের আগমন ঘটেছে। সেই সঙ্গে নানা জায়গায় গড়ে উঠেছে দরগা, মাজার ইত্যাদি। মানিক-তলায় মাণিকপীরের দরগাটিকে অনেকে বলেন কলকাতার মুসলমানদের প্রাচীনতম উপাসনাস্থল। কলকাতায় প্রাচীন নবাববংশের মধ্যে টিপু সুলতানের বংশধরেরা কলকাতায় প্রায় তেরটি বড় মসজিদ স্থাপন করেছেন। তারমধ্যে হল ধর্মতলার মসজিদ (১৮৪২) আর টালিগঞ্জের মসজিদ। অযোধ্যার নবারের বংশধরদের আনুকূল্যে মেটেবুরুজ আর গার্ডেনরিচে স্থাপিত হয়েছে ইমামবাড়া আর কয়েকটা মসজিদ। মুর্শিদাবাদের নবাদের বংশধরেরা মধ্য আর উত্তর কলকাতায় বেশ কয়েকটি মসজিদ স্থাপন করেন। ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কচ্ছী মুসলমানদের উদ্যোগে স্থাপিত হয় চিৎপুরের নাখোদা মসজিদ। প্রতিষ্ঠাতা আবদার রহিম ওসমান। সিঁদুরিয়াপট্টির হাফিজ জালালউদ্দিনের মসজিদও একটি প্রাচীন মসজিদ।

থিয়েটার-সিনেমা

ইংরেজরা শহরের শহরের পত্তন করে গুছিয়ে গাছিয়ে বসতে বসতে বেশ খানিকটা সময় চলে গিয়েছিল। তাই ১৬৯০ সালে কলকাতার পত্তন হলেও কলকাতার প্রথম নাট্যশালার জন্ম হয় ১৭৪৫ সালে। এখনকার বি-বা-দী বাগ সেদিন ছিল ট্যাঙ্কস্কোয়ার। তখনো কিন্তু এই অঞ্চলটাই ছিল কলকাতার প্রাণকেন্দ্র। তাই ট্যাঙ্কস্কোয়ার বা লালদীঘির চারপাশে গড়ে উঠেছিল সাহেব কলকাতার তাবৎ নাচ-গানের আড্ডা, রেস্তোরাঁ আর ট্যাভার্ণ। লালদীঘির উত্তর-পূর্ব কোণে তৈরী হয়েছিল কলকাতার প্রথম নাট্যশালা দি প্লে হাউস। এখানে অভিনয় করতেন অপেশাদারী অভিনেতারা। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা অভিনেতা ডেভিড গ্যারিক এই সব অভিনেতাদের অনেককেই তালিম দিয়েছিলেন অভিনয়। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্‌দৌলা কলকাতা আক্রমণের সময় প্লে হাউসের উঠোনেই কামান বসিয়েছিলেন। এখন যেখানে বড় ডাকঘর সেখানে তখন ছিল পুরনো কেল্লা। প্লে হাউস থেকে এই কেল্লার দরজা পাওয়া যেত কামানের নিশানার মধ্যে। কলকাতা দখলের যুদ্ধে প্লে হাউসের সর্বাঙ্গে কামানের গোলা লেগে নাট্যশালাটি দারুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইংরেজরা নবাবী সেনাদের হাত থেকে কলকাতাকে মুক্ত করার পর প্লে হাউসকে আবার নতুন করে সাজানো গোছানো হয়।

কলকাতার দ্বিতীয় রঙ্গালয় ক্যালকাটা থিয়েটার বা দি নিউ প্লে হাউস। জনসাধারণের টাকায় ১৭৭৫ সালে এই নাট্যশালা তৈরি হয়। খরচ হয়েছিল একলক্ষ টাকা। ওয়ারেন হেস্টিংস, এলিজা ইম্পে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই নাট্যশালা গড়ে তোলার জন্য প্রচুর অর্থ

সাহায্য করেছিলেন। 'হাটলি হাউসে' এই নাট্যশালার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ক্যালকাটা থিয়েটার তৈরি হয়েছিল পুরোপুরি বিলিতি নাট্যশালার ধাঁচে। এখানকার দারোয়ানেরা পর্যন্ত ছিল ইওরোপীয়। মিসেস ফে এই নাট্যশালার প্রশংসা করে-ছিলেন পঞ্চমুখে। ক্যালকাটা থিয়েটারে মঞ্চস্থ ভেনিস প্রিজারভ্‌ড সে সময় শহরে আলোড়ন তুলেছিল। এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা অভিনেতা অটওয়ে। ক্যালকাটা থিয়েটারে বক্স-এর টিকিটের দাম ছিল এক মোহর। পিট্‌-এর দাম ছিল বার সিক্কা টাকা আর গ্যালারির টিকিট ছয় সিক্কা টাকা। কিন্তু শহরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার প্রমোদকেন্দ্রগুলি লালবাজার অঞ্চল থেকে চৌরঙ্গিতে সরে আসে। ক্যালকাটা থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। ১৮০৮ সালে পাথুরেঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর এই নাট্যশালার জমি কিনে সেখানে একটি বাজার বসিয়েছিলেন। এরই নাম হয় নিউ চীনা বাজার।

সে যুগে চৌরঙ্গিতে অ্যামেলিয়া ব্রিসটোর বাড়ির নাট্যশালারও খুব খ্যাতি ছিল। অ্যামেলিয়া ছিলেন কলকাতার নামজাদা ব্যবসায়ী ও শেরিফ হেনরি ব্রিসটোর পত্নী। অ্যামেলিয়া নিজে যেমন একজন নামী অভিনেত্রী ছিলেন তেমনি তিনিই কলকাতার রঙ্গমঞ্চে প্রথম মহিলা শিল্পীদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। এর আগে পর্যন্ত সুদর্শন ইংরেজ তরুনেরাই স্ত্রী ভূমিকায় মঞ্চে নামত। ১৭৯০ সালে অ্যামেলিয়া চলে যান কলকাতা ছেড়ে লণ্ডনে। কিন্তু বিনোদিনী অ্যামেলিয়ার স্মৃতি কলকাতার নাট্যমোদীরা বহুদিন ভুলতে পারেননি।

বাংলা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রুশ নাট্যবিশারদ হেরাসিম লেবেডফের নাম অবিস্মরণীয়। কলকাতায় এসে লেবেডফ বাংলা শেখার জন্যে পণ্ডিত গোলক দাসকে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। ২৫ নম্বর ডুমতলা বা এখনকার এজরা ষ্ট্রীটে লেবেডফ গড়ে তুললেন প্রথম বাংলা নাট্যশালা 'বেঙ্গলি থিয়েটার'। ১৭৯৫ সালের ২৭ নবেম্বর

লেবেডফের বাংলা অনুবাদ 'দি ডিসগাইস' অভিনীত হয় এদেশের কুশী-লবদের দিয়ে। লেবেডফের নাট্যশালার মহিলা পুরুষ সকলেই অভিনয় করতেন। নাটক শুরু হবার আগে গান ও যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকত।

কলকাতার আর এক রঙ্গমঞ্চ চৌরঙ্গি থিয়েটারের জন্ম ১৮৯৩ সালের ২৫ নভেম্বর। এখনকার থিয়েটার রোড চৌরঙ্গির সংযোগস্থলে এই নাট্যশালা তৈরি হয়েছিল। হোরেস হেম্যান উইলসন এই জায়গাতেই স্থাপন করেছিলেন অ্যামেচার ড্রামাটিক সোসাইটি। এই থিয়েটার থেকেই রাস্তার নাম হল থিয়েটার রোড। চৌরঙ্গি থিয়েটার গড়ে তুলতে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। গভর্ণরও মোটা টাকা সাহায্য করেছিলেন। এই রঙ্গালয়ের যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তা হল এখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মাস মাইনে পেতেন আর অভিনেত্রীদের জন্যে রঙ্গালয়ের মধ্যেই থাকার ব্যবস্থা ছিল। চৌরঙ্গি থিয়েটারের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল শ্রীমতী এসথার লিচ-এর অতুলনীয় অভিনয়। ইংরেজ সৈনিকের কন্যা এসথার ভারতেই জন্মেছিলেন। তাঁর অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য তাঁকে বলা হত 'ইণ্ডিয়ান সিডনস'। ১৮৩৯ সালের ৩১ মে ভোর রাত্রে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চৌরঙ্গি থিয়েটার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর পনের হাজার টাকায় এই রঙ্গালয়ের জমি কিনে নেন।

নাট্যশালা ধ্বংস হলেও এসথার লিচ-এর অভিনয়ের নেশায় কিন্তু এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। ইংলিশম্যান কাগজের সম্পাদক জে এইচ স্টোকোয়েলারের সহযোগিতায় এসথার জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আশী হাজাব টাকায় গড়ে তুললেন বিরাট রঙ্গমঞ্চ সাঁসুসি থিয়েটার। এখন পার্ক স্ট্রীটে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ যেখানে সেই জমিতেই ছিল সাঁসুসি থিয়েটার। গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড এই রঙ্গালয়ের জন্যে এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন। ১৮৪১ সালের ৮ মার্চ সাঁসুসির দ্বারোদ্ঘাটন হয়। উদ্বোধন রজনীতে জেমস শেরিডান নোল-এর 'দি ওয়াইফ' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এসথার লিচ ছাড়াও

অনেক নামী অভিনেতা-অভিনেত্রী সাঁস্যুসি থিয়েটারে অভিনয় করতেন। এর মধ্যে ব্যারির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৪৩ সালের ২ নবেম্বর সাঁস্যুসিতে হচ্ছিল 'হ্যাণ্ডসাম হাজব্যাণ্ড'। এসথার লিচ ছিলেন মিসেস উইণ্ড্‌হ্যামের ভূমিকায়। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ।

সাঁস্যুসি থিয়েটার

দর্শকেরা অবাক হয়ে অভিনয় দেখছেন। উইংস-এর পাশে বিরাট বিরাট বিরাট রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছে। অসামান্য জমকালো সাজে সজ্জিতা এসথার দাঁড়িয়ে আছেন উইংস-এর পাশে স্টেজে ঢোকার অপেক্ষায়। হঠাৎ প্রদীপের শিখায় তাঁর পোশাকে আগুন লাগল। সিল্কের গাউন চড় চড় করে জ্বলে উঠে আগুনের শিখা আলিঙ্গন করল সুদর্শনা এসথারকে। সর্বাঙ্গে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে উদভ্রান্ত এসথার স্টেজে ঢুকে পড়লেন। বিহ্বল দর্শকেরা দেখল দাউ দাউ আগুনের মাঝে তাদের আরাধ্যা অভিনেত্রী এসথার ছুটে বেড়াচ্ছেন মঞ্চের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। নিমেষের মধ্যে ঝলসে গেল এসথারের দেহ। অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হল। ষোলদিন যমে-মানুষে টানাটানির পর এসথার লিচ-এর জীবননাট্যে যবনিকাপাত হল। এসথারের মৃত্যুর পর সাঁস্যুসির জনপ্রিয়তাও কেমন যেন কমে আসতে লাগল। নানাজনের হাত বদলের পর আর্চবিশপ ক্যারু. নাট্যশালাটি কিনে নিয়ে সেখানে

সেণ্ট জোনস কলেজ স্থাপন করলেন। পরবর্তীকালে এরই নাম হয়েছে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ।

সাঁস্থসি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল ওথেলা নাটকে একজন বাঙালী অভিনেতার নামভূমিকায় অভিনয়। এই অভিনেতার নাম বাবু বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। ডেসডিমনার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন একজন খাস ইংরেজ মহিলা। এই নাটক সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকরে' লেখা হয়েছিল—গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর সান্সশশি নামক থিয়েটারে যেরূপ সমারোহ হইয়াছিল, বহুদিবস হইল ঐরূপ সমারোহ হয় নাই। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের সাহেব ও বিবি এবং এতদ্দেশীয় বাবু ও রাজাদিগের সমাগম দ্বারা নৃত্যাগারের শোভা অতি মনোরম হইয়াছিল। মেং বেরি সাহেবের অনুষ্ঠানেরও কোন ত্রুটি হয় নাই, তিনি সকল বিষয়ে অতি স্থনিয়মে নির্বাহ করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় নর্ত্তক বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য ওথেলোর ভঙ্গি ও বক্তৃতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, তিনি কোনরূপে ভীতি অথবা কোন ভঙ্গি অবহেলন করেন নাই, তিনি চতুর্দ্দিগ হইতে ধৈন্য ধৈন্য শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার উৎসাহ সাহসও বদ্ধমূল হইয়াছে, যে বিবি ডেসডিমনা হইয়াছিলেন তিনি বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছেন।'

সাঁস্থসির পরে যে কটি রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল সেগুলির কোনটিই বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এই সব রঙ্গালয়ের মধ্যে ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ভ্যান গোল্ডারের 'লিরিক থিয়েটার', ময়দানের 'দি সিয়াম', 'লুইস থিয়েটার' এবং 'অপেরা হাউস'। অপেরা হাউসই পরবর্তীকালে 'দি গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউস' নামে পরিচিত হয়। কালক্রমে তা রূপান্তরিত হয় আজকের 'গ্লোব' প্রেক্ষাগৃহে।

বাংলা চলচ্চিত্রের জন্ম অনেক পরে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রথমে নির্বাক দিয়ে শুরু। তারপর চলচ্চিত্রের কথা ফুটেছে ত্রিশের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে।

প্রথম নির্বাক বাংলা ছবি 'বিল্বমঙ্গল'। প্রযোজক ছিলেন ম্যাডান

থিয়েটার্স। পরিচালক রুস্তমজী দূতিয়াল। ছবিটি ১৯১৯ সালের ৮ নভেম্বর কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে মুক্তি পেয়েছিল।

১৯৩১ সালের ২৭ জুন ক্রাউন (যার বর্তমান নাম উত্তরা) হলে মুক্তি পায় প্রথম বাংলায় সবাক ছবি 'জামাইষষ্ঠী'। এই ছবিটির প্রযোজকও ছিলেন ম্যাডান থিয়েটার্স। পরিচালক অমর চৌধুরী। আলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন টি মার্কনি। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অমর চৌধুরী, যতীন সিংহ, ক্ষিবোদ মুখার্জী, মিস গোলেলা, রানী সুন্দরী। জামাইষষ্ঠী ছিল তিন রীলের নন মিউজিক্যাল ছবি। অর্থাৎ সঙ্গীত বলে এ ছবিতে কিছু ছিল না। এর পর তৈরি হয় চার রীলের ছবি 'জোর বরাত'। সেই ছবির পরিচালক ছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়াংশে ছিলেন জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কাননদেবী, কার্তিক দে, কার্তিক রায়, প্রকাশমণি, কুঞ্জ চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পী।

রাস্তা

যদি কেউ প্রশ্ন করে কলকাতার প্রথম রাস্তা কোনটি তাহলে সহজে সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া যাবে না। সত্যি কথা বলতে কি কলকাতার প্রথম রাস্তা কোনটি সে সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না। তবে চিৎপুরই যে সবচেয়ে পুরণো রাস্তা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন মঙ্গলকাব্য ১৪৯৫-৯৬ সালে লিখিত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসা বিজয়' কাব্যে চিৎপুরের নাম পাওয়া যায়। যদিও ঐ অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত বলে অনেকের ধারণা। এছাড়া ষোড়শ শতকের শেষ নাগাদ রচিত কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে তো পরিষ্কার দেখা যায় সাধু শ্রীপতির নৌকো ভাগীরথীতে ভেসে চলেছে—

ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর সালিখা এড়াইয়া যায়॥

চিৎপুর নামকরণ সম্পর্কেও সকলেই প্রায় একমত। কাশীপুর অঞ্চলে চিত্রেশ্বরী বা চিত্তেশ্বরীর যে মন্দির আছে সেই দেবীর নাম থেকেই নাকি চিৎপুর নামের উৎপত্তি। অনেকের মতে চিত্রপুর থেকে চিৎপুর। মঙ্গলকাব্যে উল্লেখিত চিৎপুরের নাম দেখে মনে হয় সেকালে চিৎপুর একটা গ্রামের নাম ছিল। চিত্তেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে চিতে ডাকাতের নামও জনশ্রুতির একটা অঙ্গ। তবে চিৎপুরে যে একসময় দুর্ধর্ষ ডাকাত আর কাপালিকদের আড্ডা ছিল সে কথা সর্বজনবিদিত। ১৭৮৮ সালের ৬ এপ্রিল গভীর রাতে চিত্তেশ্বরী দেবীর সামনে একটা নরবলি হয়। এর পর এই মন্দিরের পুরোহিতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। চিৎপুরের রাস্তায় তখন যে বাঘের দেখা মিলত এ খবর

জানা যায় ১৮২৫ সালের সমাচার দর্পনে। ১৮২৮ সালেও চিৎপুরে সতীদাহ হয়েছিল।

ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী এই চিৎপুর। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা কলকাতা আক্রমণ করলে ইংরেজ সেনারা চিৎপুর খালের কাছে নবাবকে বাধা দেয়। নবাবের সেনাপতি মীরজাফর নাকি চিৎপুরেই সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছিলেন।

শুধু ডাকাত, কাপালিক আর সতীদাহই নয়, চিৎপুর তখন মুখরিত হয়ে উঠত নটীর নূপুর নিক্কনে। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলির উদ্যোগে চিৎপুর অঞ্চলে বাঈজীদের পত্তন হয়। চিৎপুরের গরাণহাটা অঞ্চলে সৃষ্টি হয় কীর্তনের গরাণহাটি ধারার। চিৎপুরকে ঘিরে গড়ে ওঠে কবিগান, যাত্রা, হাফ আখড়াই, ঢপকীর্তন আর সখের থিয়েটার। ১৮৭২ সালে চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের বাড়ির উঠোনে বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্ম ন্যাশনাল থিয়েট্রিকাল সোসাইটির 'নীলদর্পন' নাটকের অভিনয় দিয়ে।

বাগবাজার থেকে শুরু করে লালবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত এই দীর্ঘ পথের দুপাশে গড়ে উঠেছিল সেকালের কলকাতার বিত্তবানদের বসতি। বাগবাজার, শোভাবাজার, হাটখোলা, পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো, বড়বাজার, পোস্তা সবই ছিল বড়লোকদের বাসস্থান। মাইকেল মধুসূদন দত্ত একদা চিৎপুরের একটি বাড়িতে বাস করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থাকতেন বড়বাজারের ১৩ নম্বর দয়েহাটা স্ট্রীটের বাড়িতে। বাগবাজার থেকে লালবাজার পর্যন্ত অনেক বাজার গড়ে উঠেছে চিৎপুর রোড ঘিরে। সেকালে চিৎপুর রোড ছিল কালীঘাটে তীর্থযাত্রার একমাত্র পথ।

১৭৫৭ সালে চিৎপুরের শোভাবাজার আর পাথুরিয়াঘাটা ছিল গভীর জঙ্গলে ঢাকা। মহারাজা নবকৃষ্ণ আর ঠাকুর পরিবারের চেষ্টায় সেই জঙ্গল সাফ হয়। ১৭৩১ সালে জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র চিৎপুরে নবরত্নের এক বিরাট মন্দির তৈরি করেন। মন্দিরের চূড়ো ছিল অকটার

লোনি মনুমেণ্টের চেয়েও উঁচু। ১৭৩৭ সালের ঝড় আর ভূমিকম্পে এই মন্দির ভেঙে যায়। ১৭৬১ সালে চিৎপুরের উত্তরাঞ্চলে জমির দর ছিল পাঁচ টাকা কাঠা।

এই চিৎপুর কিন্তু প্রথম থেকেই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। তখনকার আমলের চিৎপুরের বর্ণনা দিতে গিয়ে হুতোম লিখেছিলেন—চিৎপুর রোডে মেঘ কল্লে কাদা হয়; সুতরাং কাদার জন্যে পথিকদের চলবার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। কেউ পয়নালার উপর দিয়ে, কেউ খানার ধার দিয়ে জুতো হাতে করে কাপড় তুলে চলেছেন…।

সেদিনের চিৎপুর আজও একই রকম আছে। শুধু লোক বেড়েছে, গাড়ি বেড়েছে আর সেই সঙ্গে বেড়েছে এ যুগের জ্যাম যন্ত্রণা।

ডাক

১৭৫৭ সাল। পলাশীর যুদ্ধ শেষ হল। কোম্পানি, অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিশান উড়ল তামাম বাংলা জুড়ে। ইংরেজ নায়ক ক্লাইভের আনন্দ আর ধরে না। এবার তিনি নজর দিলেন দখল করা দেশের উন্নতির দিকে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল করবার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত ডাক চলাচলের ব্যবস্থাও হল। ঐ বছর কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, রাজমহল প্রভৃতি জায়গা পর্যন্ত চিঠি বিলির ব্যবস্থা হয়।

১৭৭৪ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস ডাক ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি করেন।

১৭৯৫ সালের তেসরা মার্চ ডাক বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা থেকে বিভিন্ন জায়গায় আড়াইতোলা ওজনের চিঠিপত্র পাঠাবার মাশুল ছিল এই রকম—কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুর—দু'আনা, ব্যারাকপুর, চন্দননগর—এক আনা, রাজমহল, কটক—তিন আনা, মুঙ্গের—চার আনা, পাটনা—পাঁচ আনা, চট্টগ্রাম—ছ' আনা, কাশী—সাত আনা, হায়দরাবাদ—বার আনা, মাদ্রাজ—একটাকা দশ পয়সা, পুনা—একটাকা চার আনা।

৭৮৪ সালে কলকাতার ডাকবিভাগ থেকে জানানো হয়—বর্ষার সময় রাস্তাঘাটের অবস্থা দারুন খারাপ থাকে বলে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চারমাস ডাক বিলি বন্ধ থাকবে। ১৭৮৪ সালে পোস্টমাষ্টার জেনারেল সি ককটেল জানিয়েছিলেন সাড়ে ন'ইঞ্চি লম্বা চার ইঞ্চি চওড়া বড় মাপের খাম ডাকে পাঠানো চলবে না। প্রত্যেক সোমবার আর বৃহস্পতিবার বড় ডাকঘরে ঐ সব খামের চিঠিপত্র নেওয়া হবে।

বর্ষার সময় কলকাতা তখন অন্যমূর্তি ধারণ করত। তাই বর্ষাকালে

নৌকোয় ডাক বিলির ব্যবস্থা করা হয়। পোস্টমাষ্টার জেনারেল একটা নোটিশ দিয়ে জানান, ডাক পালকিতে যাত্রীও নেওয়া হবে।

১৭৮৪ সালের দোসরা ডিসেম্বর পোস্টমাষ্টার জেনারেল কলকাতা থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে চিঠিপত্র পাঠানোর ডাকমাশুলের হার ঘোষণা

সেকালের ডাক গাড়ি

করেন। তখনো ডাক টিকিটের প্রচলন হয়নি। যিনি চিঠি পাঠাতেন তাঁর চিঠি ডাকঘরে ওজন করার পর ডাকমাশুল ধার্য করা হত। ডাক বাহক চিঠির প্রাপকের কাছ থেকে মাশুল নিয়ে চিঠি বিলি করত।

১৭৮৯ সালে কলকাতা থেকে বোম্বাই পর্যন্ত ডাকে চিঠি বিলির ব্যবস্থা হয়। ১৭৯৫ সালে কলকাতা থেকে কোম্পানির কারেন্সি নোট ডাকে পাঠাবার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ব্যবস্থাটা ছিল এই রকম—কেউ টাকা পাঠাতে চাইলে খোলা খামে সেই টাকা ভরে ডাকঘরের কর্মচারীকে দিতেন। তিনি টাকা জমা করে নিয়ে প্রেরককে রসিদ লিখে দিতেন। ডাক মাশুল ধার্য করতেন ডাক বিভাগের কর্মী রিচার্ড অ্যামুটি। তাঁর অফিস ছিল কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে।

উন্নত ধরণের ডাকটিকিট চালু হয় ১৮৩৭ সালে। কলকাতার টাঁকশালের কর্নেল ফরবেসের নক্সা অনুযায়ী তালগাছের ছবিওয়ালা

দু'আনা দামের টিকিট প্রথমে ছাপা হয়। এরপর ইংলণ্ডের দেলারু কোম্পানির কাছ থেকে টিকিট তৈরি হয়ে আসত। ১৮৫৪ সালের মে মাস থেকে ১৮৫৫ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত কলকাতায় ডাকটিকিট ছাপা হয়েছিল ৪,৭৭,৩২,৪৯৬ খানা। সে সময় আধআনা বা দু'পয়সার টিকিট ছিল নীল রঙের, এক আনার টিকিট লাল আর চার আনার টিকিটের রং ছিল লাল-নীল মেশানো। এই সময় থেকেই সব জায়গায় এক দামের টিকিট চালু হয়। ১৮৪৫ সালে মোট চিঠি বিলি হয়েছিল ৩২, ৯১, ৬১, ৮১১ খানা।

কলকাতা তথা ভারতে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয় ১৮৪৯ সালের ৫ নবেম্বর। প্রথমে লাইন খোলা হয় কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত। সেই লাইন তখন সরকারী কাজেই ব্যবহার করা হত। যাঁর চেষ্টায় প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয় তাঁর নাম স্যার উইলিয়ম ব্রুক ওশাগ্‌নেসি। তিনি ছিলেন বেঙ্গল আর্মির ডাক্তার। তিনিই প্রথম কলকাতা থেকে বেদগিরিতে টেলিগ্রাফ লাইন বসানোর কাজে সফল হয়েছিলেন। এই লাইন বসার দরুন বর্মার সঙ্গে যুদ্ধের সময় খুব সুবিধে হয়েছিল। সর্ব সাধারণের জন্যে টেলিগ্রাফ চালু হয় ১৮৫১ সালের ১ ডিসেম্বর। ১৮৫৪ সালের ২৪ মার্চ কলকাতা থেকে আগ্রা পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন চালু হয়।
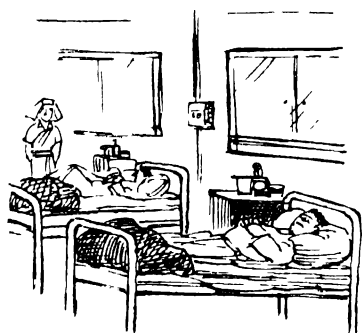
হাসপাতাল

মহানুভব বৃটিশ সরকারের পরদুঃখে কাতরতার কথা তখন কলকাতার ধনী বাবুদেব মুখে মুখে। সরকারের প্রতি বাবুদের সহানুভুতির সীমা পরিসীমা নেই। আর তারই পুরস্কার হিসেবে কলকাতার এক শ্রেণীর বড়লোক বাঙালী কুড়িয়েছেন রাজা-মহারাজা নিদেন পক্ষে রায় রায়ান খেলাত। পদবী নিয়ে মুন্সি হচ্ছেন মহারাজা বিপদের দিনে বন্ধুর মত কাজ করে অতি সাধারণ তেজারতি কারবারী সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছেন উপঢৌকন আর উপাধি।

কলকাতা কিন্তু ধীরে ধীরে এগোচ্ছে গ্রাম থেকে শহরের দিকে। সাহেবরা ধীরে সুস্থে মনের মত করে গড়ে তুলছেন শহর কলকাতাকে। কিন্তু কলকাতা তখনো জলে জঙ্গলে ঘেরা। মশা মাছির উপদ্রবে বিলিতি ব্যবসায়ীরা ওষ্ঠাগত প্রাণ। তাদেরই কাগজে তখনকার কলকাতার বর্ণনা ঃ

"১৭৪২ সালে কলকাতা শহর একটা খাল দিয়ে সীমানা করা ছিল। মারহাট্টাদের আক্রমনের বিরুদ্ধে শহরকে রক্ষা করার জন্যে এই খাল কাটা হয়। কেল্লার তিন মাইল দূরে উত্তরাঞ্চলে এই খালের শুরু।" খালের কাদা ঘোলা জল গিয়ে পড়ত নদীতে। ঐতিহাসিক ওর্মে বলেছেন,—"একেবারে দক্ষিণে প্রান্তে ছিল জলাভুমি আর নালা। তাই সেখানে মানুষ বাস করতে পারতনা। বর্ষার সময় সমস্ত জায়গাটা একটা হ্রদের রূপ নিত।"

এই ছিল তখনকার কলকাতা। তাই সায়েবরা চিন্তিত হয়ে উঠল ৮

এই রকম একটা জায়গায় শরীর ভাল রাখা যায় কি করে আর রোগ হচ্ছে তার চিকিৎসাই বা হবে কোথায়। ডাক্তার হ্যামিলটনের লেখায় অবশ্য ১৭০৯ সালেও কলকাতায় হাসপাতালের উল্লেখ আছে। কিন্তু তার বর্ণনা নেই।

কলকাতায় তখন রোগের ছড়াছড়ি। ম্যালেরিয়া, স্কার্ভি, পিত্তজ্বর তখন ঘরে ঘরে। এরই মধ্যে ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমন করলেন। সে এক ভয়ানক দুঃসময়। চিৎপুরে নবাবের সেনারা সায়েবদের সঙ্গে লড়াই করছে। জুন মাসের কলকাতা। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আর ভ্যাপসা গরম। কলকাতায় ইংরেজদের সৈন্যসংখ্যা তখন ২৭৫। তাদের মধ্যে সত্তর জন অসুস্থ। সিরাজ এলেন। কলকাতা দখল করে লুঠপাট চালিয়ে আগুন জ্বালিয়ে চলে গেলেন। কলকাতার নামও তিনি বদলে দিয়ে নতুন নাম রাখলেন আলিনগর। এর পরের বছরই পলাশীর যুদ্ধ। শঠতা আর প্রবঞ্চনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত। কলকাতায় রোগ চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালের পত্তনও এই বছরে।

আইভস্ সাহেব ছিলেন ক্লাইভের ঘনিষ্ঠ সহযোগী অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের 'কেন্ট' জাহাজের ডাক্তার।

আইভস্ ১৭৫৭ সালে তাঁর রোজ নামচায় যা লিখেছিলেন তা থেকে জানা যায় ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ আগস্টের মধ্যে কলকাতায় ৫৪ জন ইংরেজের স্কার্ভি, ৩০২ জনের পিত্তজ্বর আর ৫৬ জনের পিত্তশূল্ হয়েছিল। এর মধ্যে ৫২ জন মারা যায়। ৭ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত ৭১৭ জন রোগী কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি হয়। এদের মধ্যে ১৪৭ জন ছিল ম্যালেরিয়া আর কলেরা রোগী। এই সব রোগীর মধ্যে ১০১ জন মারা যায়। কলকাতায় মহামারী দেখা দেয়। খোদ অ্যাডমিরাল ওয়াটসনও কলকাতার মহামারীর শিকার হয়ে প্রাণ দিয়েছেন। তখনই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরেরা কলকাতায় একটা সাধারণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এই হাসপাতালেরই

পরবর্তী নাম প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল আর তারও বহু পরে শেঠ সুখলাল কারনানী মেমোরিয়াল হাসপাতাল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস কলকাতায় দেশীয় হাসপাতাল তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। কর্ণওয়ালিসের পর গভর্ণর স্যার জন শোর কলকাতায় আসেন। ১৭৯৩ সালে তিনি ফৌজদারি বালাখানায় প্রথম দেশীয়দের জন্যে হাসপাতাল খোলেন। একে বলা হত নেটিভ হাসপাতাল। এই হাসপাতালের জন্য চাঁদা উঠেছিল চুয়ান্ন হাজার টাকা। এছাড়া সরকার মাসে ৬০০ টাকা সাহায্য দিতেন। সেণ্টজন গীর্জার বিশপ জন ওয়েন এই হাসপাতালের জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন।

১৭৯৬ সালে নেটিভ হাসপাতাল ধর্মতলায় উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

কলকাতার হাসপাতাল সম্পর্কে ১৮২৫ সালের ১১ জুন সমাচার দর্পণে লেখা হয়—"হাসপাতাল। শন ১৭৯২ সালে যে হাসপাতালের অনুষ্ঠান হইয়া ইংগ্রণ্ডীয় মহাশয়ের দিগের চাঁদা দ্বারা ও শ্রী শ্রীযুত কোম্পানী বহাদরের সাহায্যেতে মোং ধর্মতলাতে স্থাপিত হইয়া তাবৎ দীন-দুঃখি লোকের দিগের উপকার হইতেছে……।"

সমাচার দর্পনে ১৮২৫ সালের ৪ জুনের খবর "নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশের লোকের নিমিত্ত চিকিৎসালয়।…এ বিস্তৃত মহানগর কলিকাতার মধ্যে বাঙ্গালি টোলায় হাসপাতাল ও ঔষধের দোকান নাই এই মহানগর মধ্যে ধন ও জনহীন অনেক বিদেশি মানুষ আছে তাহারা পীড়িত হইলে পীড়া হইতে মুক্ত হইবার কোন সাধারণ স্থান নাই ঐ সকল লোকের সামান্য রোগেতে সামান্য উপায়াভাবে প্রাণ নষ্ট হয় এবং বিষয় সত্ত্বেও অনেক লোক ঔষধ পায় না। চাঁদনিচকে যে হাসপাতাল আছে সে শহরের মধ্যস্থানে নহে বাঙ্গালি টোলা হইতে অনেক দূর আর যে প্রকার শহরের ও লোকের বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে একটি হাসপাতালের সুন্দররূপে কর্মনির্বাহ হওয়া ভার।

এই বিবেচনা পুরঃসরে কতকগুলিন মহানুভব মহাশয়েরা আর তুইটি নেটিব হাসপাতাল ও এক ঔষধেব দোকান সংস্থাপন করণের চেষ্টা করিতেছেন তাহার একটা কলুটোলার সরতীর বাগানে স্থাপিত হইবেক দ্বিতীয় শোভাবাজারে স্থাপন করিবেন সেই ২ স্থানে দেশি ও বিলাতি নানা প্রকার বহুবিধ বোগেব ঔষধ পাওয়া যাইবেক রোগি ব্যক্তিরা বিনা ব্যয়ে ঔষধ পাইবেক।····সং চং।"

ঐ পত্রিকায় ১৮২৬ সালেব ৮ জুলাইয়ের খবর—"চিকিৎসালয়। আমরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্বক প্রকাশ কবিতেছি নেটিব হাসপাতালেব অর্থাৎ চিকিৎসালয়ের কর্ত্তারা গবর্নমেণ্টেব আজ্ঞানুসাবে এতদ্দেশীয় দীন তুঃখি পীড়িত লোকেবদের চিকিৎসার্থে তুই চিকিৎসালয় নিরূপিত কবিয়াছেন বিশেষতঃ কলিকাতাব গরাণহাটায় নং ৩২৭ বাটীতে এক ও চৌরঙ্গিব
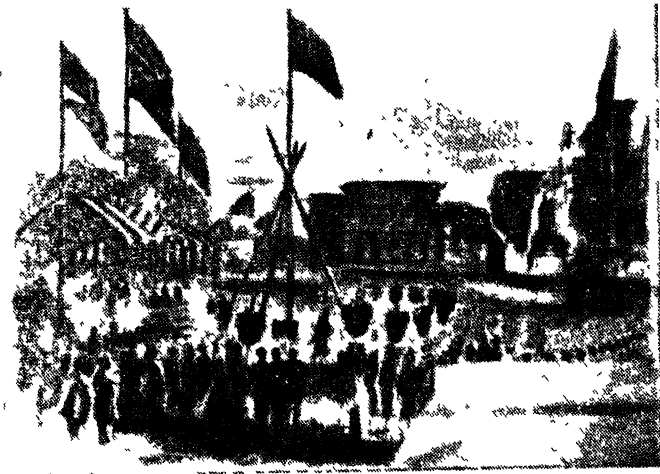
কলকাতার মেডিকেল কলেজের ভিত্তিস্থাপন

পার্কস্ত্রীট নং ১০ বাটীতে এক। এই নিরূপিত স্থানেতে ১ আগস্ত তারিখ অবধি পীড়িত লোক গতমাত্র ঔষধ পাইবেক।"

কলকাতার মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৩৫ সালে। এর সংলগ্ন হাসপাতাল স্থাপিত হয় ১৮৪৮ সালে। ঐ বছর ৩০ সেপ্টেম্বর

লর্ড ডালহৌসি হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৫২ সালের ১ ডিসেম্বর হাসপাতালের দ্বারোদঘাটন হয়। হাসপাতালের জন্যে জমি দিয়েছিলেন মতিলাল শীল। আগে এই জমিতে ছিল পেটি কোর্ট জেল। এই জেলখানাতেই মেডিকেল কলেজের কাজ শুরু হয়। ১৮৩৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি কলেজের ক্লাস শুরু হয়। ছত্রিশ সালের ১০ জানুয়ারী পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত তাঁর লেকচার টেবিলে একটি শবদেহ আনেন। পাশের একটা ঘরে খুব গোপনে অধ্যাপক গুডিভের সঙ্গে মধুসূদন সেই শব ব্যবচ্ছেদ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ছাত্র উমাচরণ শেঠ, দ্বারকা নাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে। রাজকৃষ্ণই ছাত্র হিসেবে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেন। সেদিন কেল্লা থেকে তোপ পড়েছিল এই উপলক্ষে। ১৮৪৪ সালের ৮ মার্চ প্রথম চারজন বাঙালী ছাত্র ভোলানাথ বসু, গোপাল চন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বসু আর সূর্যকুমার চক্রবর্তী বিলেত যান ডাক্তারি পড়তে। তিনজনের খরচ দিয়েছিলেন ডাক্তার গুডিভ আর দ্বারকানাথ ঠাকুর। মড়াকাটার সময় দ্বারকানাথ নিজে দাঁড়িয়ে থাকতেন টেবিলের পাশে।
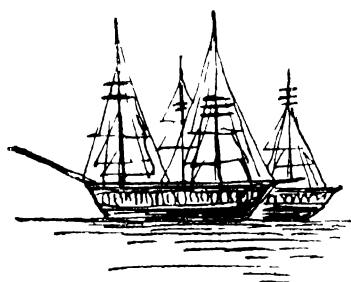
জাহাজ

১৬৯০সালের ২৪ আগস্ট জোব চার্নক সুতানুটির ঘাটে এসেছিলেন নৌকো চেপে। কলকাতা তখন জলেঘেরা একটা জংলা জায়গা। যানবাহন বলতে নৌকো, বজরা, স্লুপ আর পানসি। তবে জাহাজও দেখা যেত। পর্তুগীজ বণিকেরা আসত জাহাজ চেপে। তারপর আসত ইংরেজরাও।

তারপর কলকাতা তৈরি হল সায়েবদের কেনা জায়গাকে অনেক দিন অনেক বছর ধরে ঘষেমেজে। নৌকো কিন্তু তখনো ছিল পরিবহনের একমাত্র উপায়। ১৭৮১ সালে নৌকোর ভাড়া ছিল ৮ জন দাঁড়ির বজরা দৈনিক ২ টাকা, ১০ জন দাঁড়ির আড়াই টাকা, ১২ জনের সাড়ে তিন টাকা, ১৪ জনের ৫ টাকা, ১৬ জনের ৬ টাকা, ১৮ জনের সাড়ে ছ' টাকা, ২০ জনের ৭ টাকা, ২৪ জনের ৮ টাকা।

চার দাঁড়ির নৌকোর মাসিক ভাড়া ছিল ২২ টাকা, পাঁচ দাঁড়ির ২৫ টাকা, ছ' দাঁড়ির ২৮ টাকা।

আড়াইশো মণের নৌকো ভাড়া ২৯ টাকা, তিনশো মণের ৩৪ টাকা, চারশো মণের ৪০, টাকা, পাঁচশো মণের সাড়ে পঞ্চাশ টাকা।

তখনকার দিনে জলপথে কলকাতা থেকে বহরমপুর যেতে কুড়িদিন, মুর্শিদাবাদ পঁচিশ দিন, রাজমহল সাঁইত্রিশ দিন, মুংগের পঁয়তাল্লিশ দিন, পাটনা ষাট দিন, কাশী পঁচাত্তর দিন লাগত। জলপথে কোম্পানির

মালপত্র পাঠানোর একচেটিয়া কারবার ছিল মেসার্স হোমস্ অ্যাণ্ড অ্যালন কোম্পানির।

ইংরেজরা নৌকোয় যাতায়াতের অসুবিধে দেখে জাহাজ তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। ১৭৬৯ আর ৭০ সালে কলকাতায় প্রথম যে দুখানা জাহাজ তৈরি হয় সে দুখানা জাহাজই ছিল কাঠের। ১৭৭১ সালে ৪২৩ টন ভার বহনের উপযুক্ত যুদ্ধ জাহাজ নন্ সাচ তৈরি হয়। এই জাহাজে একত্রিশটা কামান রাখার জায়গা ছিল। এর আট বছর পরে বত্রিশ কামানের যুদ্ধ জাহাজ 'সারপ্রাইজ' তৈরি হয়। এই জাহাজ এদেশের কারিগরদের কাজের অনবদ্য নিদর্শন। ১৭৮১ সাল থেকে

ফেয়ারী কুইন ইঞ্জিন

কুড়ি বছরের মধ্যে সাতাশ খানা জাহাজ তৈরি হয়েছিল। টিটাগড়েও জাহাজ তৈরি হত।

কলকাতার ডক তৈরির প্রথম প্রস্তাব হয় ১৭৫৮ সালে। ১৭৮০ সালে কাজ শুরু হয়। ডক তৈরি করতে খরচ হয় দশ লক্ষ টাকা। ১৭৯৬ সালে শালকিয়ার ডক তৈরি করেন বেকন সাহেব। এই ডকে প্রথমে যে জাহাজ মেরামত করা হয় তার নাম ছিল অরফিয়াস। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কোন্নগরেও একটা ডক ছিল।

১৮০৭ সালের ৩১ মার্চ খিদিরপুরে প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ চালান হয়। ঐ জাহাজের নাম ছিল 'জন শোর'। ১৮২৬ সালে কলকাতা থেকে চুঁচুড়া পর্যন্ত প্রথম দৈনিক স্টিমার লাইন খোলা হয়। তখন ভাড়া ছিল মাথা পিছু আট টাকা। প্রথম দিকে যে দুখানা স্টিমাব চলত তাব নাম ছিল 'ফায়াব ফ্লাই' আর 'কমেট'।

প্রথম যে স্টিম ইঞ্জিনেব জাহাজ লণ্ডন থেকে কলকাতায় আসে তার নাম ছিল 'এণ্টার প্রাইস'। ১৮২৭ সালেব ১৬ আগস্ট ফলস্ মাউথ বন্দব থেকে ছেড়ে ১৩০ দিনে কলকাতায় এসে পৌছয়। জাহাজটায় ছিল দুটো ষাট ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট ইঞ্জিন।
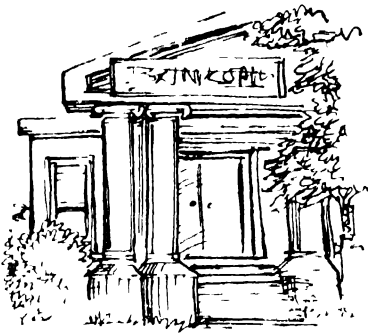
ব্যাঙ্ক

প্রায় আড়াই শো বছর আগের ঘটনা। কলকাতার গঙ্গায় ইংরেজদের একখানা নৌকো ডুবে যায়। নৌকোর সমস্ত লোকজন আর মালপত্র ডুবে গেল। শুধু একজন গোরা খালাসী ভাসতে ভাসতে গঙ্গার পূর্ব কূলে এসে উঠল। সেখানে তখন বসে জপ করছিলেন সেদিনের কলকাতার ডাকসাইটে ধনী লক্ষ্মীকান্ত ধর, যিনি পরিচিত ছিলেন নকুধর নামে। সেই খালাসীকে উদ্ধার করে নকুধর নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তারপর চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তুললেন। ইংরেজ খালাসীটি বেশ কিছুকাল নকুধরের পোস্তাব বাড়িতে ছিল। তার কাছেই নকুধর ইংরিজি শিখে সাহেব মহলে দোভাষীর কাজ নেন। বিপুল অর্থের অধিকারী নকুধর ইংরেজদের লক্ষ লক্ষ টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করতেন। কারণ তখন কলকাতায় সাহেবরা ব্যাঙ্ক তৈরি করেনি।

নকুধর ছিলেন খোদ ক্লাইভের ব্যাঙ্কার। ক্লাইভ নিয়মিত আসতেন পোস্তার বাড়িতে। ইংরেজরা নকুধরের সহযোগিতায় সন্তুষ্ট হয়ে ১৭৬২ সালের ৫ জুলাই তাঁকে খেলাৎ দেয়। মহারাজা উপাধিও ইংরেজরা দিতে চেয়েছিল নকুধরকে। কিন্তু তিনি নিজে সেই উপাধি না নিয়ে তাঁর দৌহিত্র সুখময় রায়কে মহারাজা উপাধি দেবার জন্যে অনুরোধ জানান। সুখময় রায়কে দিয়েই পোস্তার রাজবংশের গোড়া-পত্তন আর এই সুখময় রায়ই ছিলেন কলকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কের প্রথম এবং একমাত্র বাঙালী ডিরেক্টর।

কলকাতায় ব্যাঙ্কের জন্ম ১৭৭০ সালে। নাম ছিল হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক। কিন্তু ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ার দরুণ এই ব্যাঙ্কের দরজায় তালা পড়ে। ১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস স্থাপন করেন গভর্ণমেন্ট সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক। কিন্তু পরিচালকদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হওয়ার ফলে ১৭৭৫ সালে ব্যাঙ্কটি উঠে যায়। ১৮০৬ সালে খোলা হয় 'ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা'। ১৮০৯ সালে এই ব্যাঙ্ক বেঙ্গল ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত হয়। সে বছর ২ জানুয়ারি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের পরিচালকদের প্রথম সভা হয়। এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছিল রাজা তৃতীয় জর্জের সনদ আর বড়লাট লর্ড মিণ্টোর অনুমতিক্রমে। ডিরেক্টর বোর্ডের প্রথম সভাপতি ছিলেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল এস জি. টাকার। ব্যাঙ্কের মূলধন ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। প্রতিটি শেয়ার দশ হাজার টাকা হিসেবে পাঁচশোটি শেয়ার ছিল। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক নোট প্রচলনেব অনুমতিও পেয়েছিল। জ্যাকব রাইডার ও এডোয়ার্ড হের নামে এই নোট প্রচলিত ছিল। পাঁচশো, একশো, পঞ্চাশ টাকা আর এক মোহরের নোট বাজারে ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু তখনকার দিনেও নোট জাল হত। এছাড়া ছিল কর্মচারীদের অসাধুতা। ১৮২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। রাজকিশোর দত্ত নামে একজন লোক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাগজ বন্ধক রেখে কিছু টাকা ধার চায়। কোম্পানির কাগজ দেখে সেক্রেটারি জে. এ. ডারিন জানান কাগজগুলি জাল। কিন্তু অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল কাগজগুলি ঠিক আছে বলে মত প্রকাশ করেন। রাজকিশোর দত্তকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। পরে জানা যায় কাগজগুলি সত্যিই জাল ছিল।

১৮১৯ সালে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ও ১৮২৪ সালে ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ১৮২৯ সালের ৭ আগস্ট সম্মিলিতভাবে গড়ে ওঠে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা করেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, জে. জি. গর্ডন, জন পামার, মিঃ কলডার ও জেমস ইয়ং। প্রথম ডিরেক্টর বোর্ডে ছিলেন দ্বারকানাথ। ব্যাঙ্কের মূলধন ছিল প্রায় পনের

লক্ষ টাকা। জয়েণ্ট স্টক ধাঁচের প্রথম ব্যাঙ্ক হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে। ব্যবসা আর চাষবাসের কাজে অর্থ সাহায্য দেওয়াই ছিল এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। নানা কারণে ১৮৪৭ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন ঘটে। তখনকার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পরিচালক ছিলেন ম্যাকিনটশ কোম্পানি। দ্বারকানাথ ছিলেন ম্যাকিনটশের অংশীদার। স্বাভাবিকভাবে তিনি এই ব্যাঙ্কেরও অন্যতম পরিচালক ছিলেন। ১৮৩৩ সালে ম্যাকিনটশ কোম্পানি ফেল পড়ে। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কেরও আয়ু শেষ হয়। কিন্তু দ্বারকানাথ কাউকে ফাঁকি দেন নি। ১৮৩৩ সালের ৫ জানুয়ারি সমাচার দর্পণে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে জানা যায়—'শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ ব্যাঙ্কের যত দাওয়া আছে তাহা পরিশোধ করিবেন।'

১৮৩৬ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকেরা পার্লামেণ্টের আইন অনুযায়ী কোম্পানির সনদ অনুসারে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্কে প্রথম বেসরকারী ব্যক্তি টমাস ব্রেকেন সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। তিনি এর আগে আগ্রা ব্যাঙ্কে ছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল সেকালের ব্যবসায়ীদের আন্দোলনের ফলে।
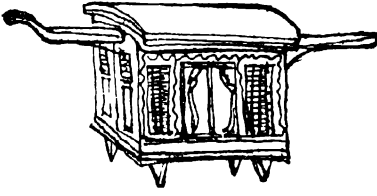
পালকি

কাঁচা মাটির রাস্তা। এবড়ো খেবড়ো। সেই রাস্তা ধরে ছয় বেহারার কাঁধে চলেছে পালকি। পালকির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে কয়েকটা ছোট ছেলে। কাতর গলায় তারা বলছে—মী, পুয়োর বয় স্যার। পালকির পর্দা সরিয়ে হাসতে হাসতে হাত নেড়ে সেই আবেদনে সম্মতি জানাচ্ছেন এক সাহেব। সাহেবের নাম ডেভিড হেয়ার। তখনকার দিনে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হবার জন্যে ছেলেরা এইভাবে কাকুতি মিনতি করত। সাহেবরা যাতায়াত করতেন পালকিতে। ঘোড়ার গাড়ি কলকাতায় আসার বহু আগে থেকেই পালকি ছিল স্থলপথের একমাত্র কনভেয়ান্স।

পালকি ছিল নানা ধরণের। সাধারণত এক একটা পালকির দাম ছিল দেড়শো থেকে তিন-চারশো টাকা। প্রায় সব পালকিতেই একজন মাত্র লোক যেতে পারত। প্রথম আমলের পালকি অবশ্য ঘেরা ছিল না। চারদিক খোলা থাকত। ওপরের চালের দিকের মাঝখানটা থাকত উঁচু। বড়লোকেরা বেশ জমকালো পালকি ব্যবহার করতেন। এর পরের যুগে ঢাকা পালকি আর চেয়ার পালকির প্রচলন হয়। তঞ্জাম ছিল অনেকটা চেয়ার পালকিরই মত। তঞ্জাম তৈরি হয়ে আসত বিলেত থেকে। বেন্টিঙ্ক তঞ্জামে চড়ে যাতায়াত করতেন।

পালকি বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ছ'জন বেহারা লাগত। এছাড়া সঙ্গে থাকত ছাতা বরদার। যাত্রীর মাথা বাঁচাত ছাতা ধরে। পলাশির যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বড় ধরনের কর্মচারী ছাড়া আর কেউ পালকিতে চড়তে পারত না।

তখনকার দিনে কলকাতা থেকে পালকি ভাড়ার হার ছিল এই রকম ঃ—

চন্দননগর—সাড়ে বাইশ টাকা থেকে সাড়ে চব্বিশ টাকা।

হুগলি, চুঁচুড়া, বংশবাটি—সাড়ে বিয়াল্লিশ টাকা থেকে সাড়ে ছেচল্লিশ টাকা।

মুর্শিদাবাদ—একশো সাতচল্লিশ টাকা আট আনা থেকে একশো উনষাট টাকা আট আনা।

ভাগলপুর—তিনশো আটাশ টাকা বার আনা থেকে তিনশো চুয়ান্ন টাকা বার আনা।

মুংগের—তিনশো ছিয়াত্তর টাকা চার আনা থেকে চারশো ছ'টাকা চার আনা।

পাটনা—পাঁচশো টাকা থেকে পাঁচশো চল্লিশ টাকা।

কাশী—সাতশো সাত টাকা আট আনা থেকে সাতশো চৌষট্টি টাকা।
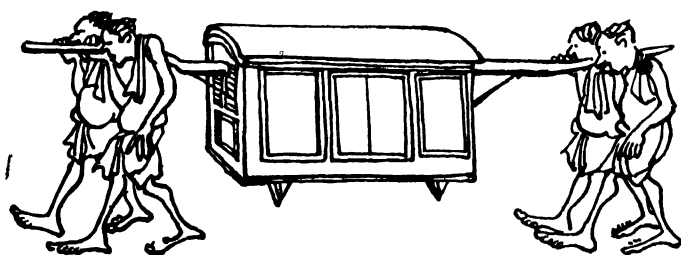
পালকি

পালকি বেহারার কাজ ছিল ওড়িশা বাসীদের এক চেটিয়া। ১৭৭৬ সালে সরকার ঠিকা বেহারাদের যে দর বেঁধে দেন তা ছিল এই রকম—

৫ জন ঠিকাবেহারা দৈনিক সিক্কা—১ টাকা।

৫ জন ঠিকাবেহারা আধদিন—আট আনা।

(তখন আধ দিন ধরা হত প্রায় আট ঘণ্টায়)

পালকি ডাক ছিল অনেকটা পালকির মতই দেখতে। তফাৎ ছিল শুধু তাতে চাকা লাগানো থাকত। এ গাড়ি মানুষে টানত আবার কখনো কখনো ঘোড়াও জুতে দেওয়া হত। ১৮৫০ সালে কলকাতা থেকে কানপুর পর্যন্ত ডাক লাইন চালু করা হয়েছিল।

আজকের কলকাতার ধর্মঘটের জনক কিন্তু সেদিনের পালকির বেহারারা। ১৮২৭ সালে সরকার এক আদেশে জানালেন সমস্ত ঠিকা বেহারাকে লাইসেন্স করাতে হবে আর সেই লাইসেন্সটি তাবিজের মত বেঁধে রাখতে হবে জামার হাতার ওপর। বেহারাদের নিজেদের পয়সায় এই তাবিজ কিনতে হবে। কিন্তু বেহারারা এই আদেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কারণ তারা মনে করত হাতে তাবিজ বাঁধা মানে জাত খোয়ানো। তাই এই আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতার পালকি বেহারারা গর্জে উঠল। ক্যালকাটা প্লেনস্‌এ (এখনকার ময়দান) মিটিং হল বেহারাদের। প্রস্তাব নেওয়া হল কেউ কাঁধে পালকি ওঠাবে না। কলকাতা উত্তাল হয়ে উঠল প্রথম শ্রমিক আন্দোলনে। বাবুদের মাথায় হাত। কাজকর্ম সব বন্ধ। শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থানী বেহারারা কলকাতায় এসে পালকি ঘাড়ে নিয়ে বড়লোকদের সমস্যা অনেকটা মেটাল। কিন্তু ততক্ষণে কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ির আদিপর্ব শুরু হয়ে গেছে।
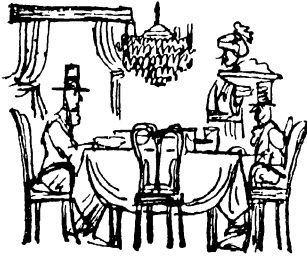
হোটেল

১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইওরোপ থেকে ফিরবেন কলকাতায়। মধুসূদনের সবচেয়ে বড় শুভার্থী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মধুসূদনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে বেশ জাঁক-জমক করে আয়োজন করেছেন। সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কয়েকখানা ঘর সাহেবী আসবাব পত্র দিয়ে সাজানো হয়েছে। পণ্ডিত তো জানেন তাঁর বন্ধুর সায়েবিয়ানার কথা। তাই যতটা সম্ভব বিলিতি কায়দায় সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু মধুসূদন কলকাতায় ফিবে সোজা এসে উঠলেন তখনকার কলকাতার সবচেয়ে নামী সায়েবী হোটেল স্পেনসেস-এ। বিদ্যাসাগর আর কী করেন! বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে তিনিই এলেন মধুসূদনের সঙ্গে দেখা করতে। হোটেলে ঢুকতেই মধুসূদন বিদ্যাসাগ-কে দেখে 'হ্যালো বিদ্, মাই ডার্লিং ফ্রেণ্ড' বলে ছুটে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগলেন। সে যুগের কলকাতার দুজন শ্রেষ্ঠ মণীষীর মিলন এইভাবে হল স্পেনসেস্ হোটেলে।

হোটেল বলতে যা বোঝায় তা আঠারো শতকের কলকাতায় সম্ভবত ছিল না। কারণ তখন বাইরে থেকে কলকাতায় এসে বেশিদিনের জন্যে থাকার লোক ছিল খুবই কম। দু চারজন যারা কাজকর্মে আসত তারা থাকত ট্যাভার্নে। লণ্ডনের মত তখন কলকাতাতেও গড়ে উঠেছিল ট্যাভার্ন। এই সব ট্যাভার্ন চালাত ইওরোপীয়ানরা। আর ছিল পাঞ্চ হাউস। শুধু খানা আর পিনার জায়গা। বাঙালীবাবুরা সে সব জায়গায় গিয়ে হুল্লোড় করাটা আদৌ পছন্দ করতেন না। আজকের

বিবাদী বাগ বা ড্যালহৌসি স্কোয়ার, ছিল তখন ট্যাঙ্ক স্কোয়ার। এই ট্যাঙ্কস্কোয়ার, লালবাজার, বৌবাজার আর কসাইটোলা বা বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল সমস্ত ট্যাভার্ন আর পাঞ্চ হাউস। ১৭৮০ সালে লালবাজার অঞ্চলে হারমনিক ট্যাভার্ন ছিল উঁচু দরের আড্ডাখানা। ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ত্রী ছিলেন হারমনিক ট্যাভার্নের একজন পৃষ্ঠপোষক। জেমস অগাস্টাস হিকি হারমনিক ট্যাভার্নের আমোদ প্রমোদ নিয়ে তাঁর কাগজে দারুণ বিদ্রূপ করতেন। ১৭৮৫ সালে হারমনিক ট্যাভার্নে ওয়ারেন হেস্টিংসকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটা সভা হয়েছিল।

ধর্মতলা আর চীনাবাজার অঞ্চলে সায়েবদেব দেখাদেখি বাঙালীরাও

পাঞ্চ হাউস খুলেছিলেন। চীনা বাজারে একটা পাঞ্চ হাউসের মালিক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ দত্ত।

কলকাতার প্রথম হোটেল বলতে স্পেন্সেস হোটেলকেই বোঝায়। সম্ভবত ১৮৩০ সাল নাগাদ এই হোটেলের পত্তন হয়েছিল। এর মালিক ছিলেন জন স্পেন্স। সে সময় চাঁদপাল ঘাটে কেউ এসে নামলেই পালকি বেয়ারারা গিয়ে তাকে ছেঁকে ধরে বলত কোথায় যাবেন? তারপর তাকে নিয়ে সোজা গিয়ে উঠত বড় পোচখানা বা স্পেন্সেস

হোটেলে। স্পেন্সেস হোটেলের খরচও ছিল খুব বেশি। একজনের একখানা ঘর, জলখাবার, ডিনার সব মিলিয়ে মাসে একশো টাকা। কিন্তু অন্যান্য বিবরণে জানা যায় এই খরচ ছিল আরো বেশি।

স্পেন্সেস ছাড়া কলকাতার নামী হোটেলের মধ্যে ছিল উইলসন বা অকল্যাণ্ড হোটেল। ১৮৩৫ সালে ডেভিড উইলসন এই হোটেল স্থাপন করেন। অকল্যাণ্ড হোটেলই পরে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল নামে পরিচিত হয়।

সংবাদপত্র

দু'শো বছর আগে ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারির ভোরে কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল ভারতের প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট ওরফে ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার। মালিক আর সম্পাদক ছিলেন জেমস অগাস্টাস হিকি। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ইংরাজী ভাষায়। চার পৃষ্ঠার এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি রাধাবাজারের বেঙ্গল গেজেট প্রেসে ছাপা হত। তখনকার দিনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রকাশের ঘোর বিরোধী ছিল। ১৭৭৬ সালে কোম্পানির কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টস এদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁকে ইংলণ্ডে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

হিকি সাহেব সংবাদপত্র প্রকাশ করলে ইংরেজ সরকার নানাভাবে তাঁকে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু সাংবাদিকতা ছিল হিকি সাহেবের আদর্শ। তাই তিনি সরকারের সমস্ত বাধা উপেক্ষা করেই বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করে যেতে লাগলেন। বেঙ্গল গেজেটের প্রচার সংখ্যা কত ছিল তা ঠিক জানা যায় না। তবে বিভিন্ন কারণে কাগজটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বলে প্রায়ই এর পুনর্মুদ্রণ করতে হত। ১৭৮১ সালের ১৪ এপ্রিলের সংখ্যায় এই পুনর্মুদ্রণের কথা জানা যায়। সাংবাদিকতার বিচারে হিকির কাগজের মান হয়ত খুব উঁচু দরের ছিল না। কিন্তু রাজ শক্তির কঠোর সমালোচনা করে হিকি যে নিদর্শন রেখে গেছেন তা তুলনাহীন। পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে হিকিকে যে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করিতে হয়েছিল তারও তুলনা মেলা ভার। সমসাময়িক কেউই হিকির সমালোচনা থেকে বাদ পড়তেন না। বাংলার গভর্নর

ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর পত্নী এবং এলিজা ইম্পের বিরুদ্ধে হিকির কাগজ সমালোচনার ঢেউ তুলেছিল। সাইমক ড্রন, কর্ণেল টমাস, ডিন পিয়ার্স আর কিরেণ্ডারের মত বিশিষ্ট যাজকও হিকির আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন। হেস্টিংস-এর পত্নীর বিরুদ্ধে কঠোর এবং কিছুটা অশালীন মন্তব্য করার ফলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ হিকিকে শাস্তি দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। এক আদেশ জারি করে সরকার ১৭৮০ সালের ১৪ নভেম্বর বেঙ্গল গেজেটের বিলি বন্ধ করে দিলেন। সরকারের মতে 'কাগজটি ব্যক্তিগত চরিত্রহনন কবে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষেব সৃষ্টি করছে।' কিন্তু এতেও হিকি দমলেন না। সমান তালে সরকারী আমলা আর গভর্নরের বিরুদ্ধে সমালোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি লিখলেন —'আপোষ করার আগে হিকি হোমারেব মত গাথা রচনা করে কলকাতার পথে পথে বিলি করবে....।' আমলাদেব কাছে আপোষ করার প্রশ্নে আগুনের মত জ্বলে উঠে হিকি বললেন 'দাসত্ব আর নিপীড়নের কাছে আত্মসমর্পণ করব না। গ্রেট বৃটেনের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে বলব আমার কথা।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিকির সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক তিক্ততার চরম পর্যায়ে পৌঁছোয়। ১৭৮১ সালে পাদ্রী কিরেণ্ডার হিকির নামে মামলা দায়ের করেন। বিচারে পাঁচশো টাকা জরিমানা হয়। তবুও হিকি কলম থামান নি। তিনি প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করতে থাকেন। ইম্পে আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে হিকির ছাপাখানায় সৈন্য পাঠালেন হিকিকে গ্রেপ্তার করতে। হিকি আদালতে আত্মসমর্পণ করতে চাইলে তাঁর কাছ থেকে আশি হাজার টাকা জামিন চাওয়া হয়। স্বভাবতই হিকি এই টাকা দিতে পারলেন না। তখন তাঁকে জেলে আটক করা হয়। আদালত অবমাননার মামলায় হিকির এক বছর কারাদণ্ড আর দুশো টাকা জরিমানা হয়। একই সঙ্গে চলে হিকির বিরুদ্ধে হেস্টিংসের মামলা। হিকির সর্বনাশের শুরু এখান থেকেই। কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও হিকিকে দমানো সম্ভব হয় নি। জেলের

ভেতরে থেকেই তিনি হেস্টিংস-এর পত্নী আর ইম্পের বিরুদ্ধে লিখতে থাকেন। হেস্টিংস-এর সঙ্গে অযোধ্যার বেগম আর চৈৎ সিংয়ের যোগাযোগের কথা হিকিই প্রথম ফাঁস করেন। এর জন্যে শাস্তিও তাঁকে পেতে হয়েছিল অনেক। সরকার নতুন করে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা এনে উনিশ মাসের কারাদণ্ড দিলেন। সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেও হিকি তাঁর ছাপাখানা রক্ষা করতে পারলেন না। সরকার সব কিছু বাজেয়াপ্ত করলেন। হিকির স্ত্রী আর সন্তানেরা নিদারুণ দুঃখেকষ্টে অনাহারে দিন কাটাতে থাকেন।

ভারতবর্ষের তথা কলকাতার প্রথম পত্রিকা বেঙ্গল গেজেট ছিল সাপ্তাহিক। চার পৃষ্ঠার কাগজ। তিন কলামে ভাগ করা এক এক পৃষ্ঠা। কলকাতার স্থানীয় খবর আর ইওরোপের বিভিন্ন কাগজ থেকে সংগ্রহ করা খবর। তখনকার কলকাতায় মন্থর জনজীবনে খবরের ছড়াছড়ি ছিল না। তাই হিকির কাগজে কেচ্ছা থাকত খুব বেশি। বিজ্ঞাপনও থাকত ঠাসা। বাস্টিড সাহেব তাঁর 'ইকোজ অফ ওল্ড ক্যালকাটা' গ্রন্থে হিকিকে অপদার্থ বলে আখ্যা দিলেও তিনি তাঁকে ভারতীয় সংবাদপত্রের পথিকৃৎ বলে সম্মান জানাতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। মাত্র দু' বছর দু' মাস বয়সে বেঙ্গল গেজেটের আয়ু শেষ হলেও জেমস অগাস্টাস হিকির প্রদর্শিত পথেই দু'শো বছর ধরে সংবাদপত্র এস্টাব্লিশমেন্টের সমালোচনা করে তার ভূমিকা পালন করে আসছে। এদেশে আমলাদের যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে হিকিই প্রথম প্রতিবাদ।
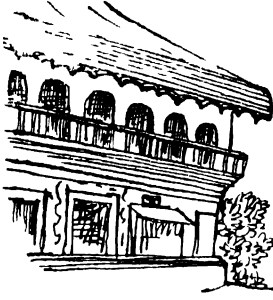
মাদ্রাসা

ইংরেজরা কলকাতা পত্তনের কিছুদিনের মধ্যে একটু গুছিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয়দের ইংরাজী ভাষা শিখিয়ে পড়িয়ে নিজেদের কাজের সুবিধের জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। অফিস কাছারি আব আদালতে কাজের জন্যে ইংরাজী শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই কলকাতার এখানে সেখানে গড়ে উঠতে লাগল স্কুল।

কলকাতায় তখন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কিছু শিক্ষিত মুসলমান গভর্নব জেনারেল ওয়াবেন হেস্টিংসের সঙ্গে দেখা করে জানালেন, তাঁরা মজিদউদ্দীন নামে এক পণ্ডিতের সন্ধান পেয়েছেন। এই পণ্ডিতকে নিয়ে একটা মাদ্রাসা বা স্কুল গড়ে তুলতে পারলে কলকাতার মুসলমান ছাত্রেরা আইন শিখে সরকারকে সাহায্য করতে পারবে। হেস্টিংস এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে মজিদউদ্দীনকে মুসলমানদের স্কুল চালাবার দায়িত্ব দিলেন। এই স্কুল বা মাদ্রাসা চালাবার জন্যে হেস্টিংস মাসে ৬২৫ টাকা খরচ দিতেন। মাদ্রাসার বাড়ি তৈরির জন্যে কিছুদিন পরে হেস্টিংস ৫৬৪১ টাকা দিয়ে বৈঠকখানার কাছে পদ্মপুকুরে একটা জমি কিনলেন। সাতমাস নিজের টাকায় মাদ্রাসা চালাবার পর হেস্টিংস বোর্ডের কাছে প্রস্তাব দিলেন সরকারকে মাদ্রাসা চালাবার দায় দায়িত্ব নিতে। বিলেতে চিঠি গেল হেস্টিংসের প্রস্তাব জানিয়ে। কিন্তু সরকারী খরচে মাদ্রাসা চালাবার ব্যবস্থা পাকাপাকি হয় এরও বছর খানেক পরে। হেস্টিংস একবছর মাদ্রাসা চালাবার খরচ খরচা বাবদ ১৫২৫১ টাকা আর পদ্মপুকুরের জমির দরুন ৫৬৪১ টাকা দেবার জন্যে বোর্ডের কাছে অনুরোধ জানান।

আগে যেখানে মাদ্রাসাব বাড়ি ছিল সেই জায়গাটা ছিল অস্বাস্থ্যকব। এব পবিবেশও ঠিক ছাত্রদেব উপযুক্ত ছিল না। তাই তখনকার দিনে মুসলমান প্রধান অঞ্চল কলিঙ্গাতে (এখনকাব ওয়েলেসলি স্কোয়াব)
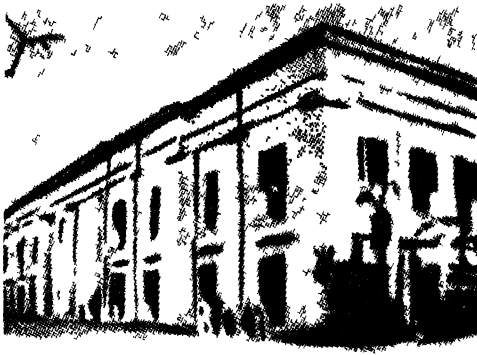
কলকাতার মাদ্রাসা

নতুন মাদ্রাসাব বাড়ি তৈবিব সিদ্ধান্ত নেওযা হয়। ১৮২৪ সালেব ২৪ জুলাই সমাচাব দর্পণে এই মাদ্রাসা স্থাপন প্রসঙ্গে লেখা হয— 'সংপ্রতি শুনা গেল ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবাব শহব কলিকাতাতে এক মহম্মদী মদবসা অর্থাৎ পাঠশালাব মূল প্রস্তব সংস্থাপন হইয়াছে।'

লটারি

লটারি। রাতারাতি বড়লোক হবার একটা সোজা পথ। এখনকার লটারি মানে এক টাকার টিকিট কাটলে রাতারাতি লাখপতি। পুরস্কারেও প্রতিযোগিতা। পুরস্কারের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে দাঁড়িয়েছে একান্ন লাখ টাকায়।

লটারি কিন্তু কলকাতায় নতুন নয়। লর্ড ওয়েলেসলির আমলে কলকাতা ছিল খাল-বিলে ঘেরা একটা আধা শহর আধা পাড়াগাঁ। কলকাতাকে পুরোপুরি শহরে পরিণত করার জন্যে ওয়েলেসলি লটারির মাধ্যমে টাকা তোলার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে লটারি খেলা আরম্ভ হয় ১৭৮৮ সালে। এই লটারিতে টিরেটা বাজারটি (প্রচলিত উচ্চারন টেরিটি বাজার) একটি 'প্রাইজ' হিসেবে ধরা হয়। বাজারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভিনিশের এডোয়ার্ড টিরেটা। ১৭৮৮ সালের ১১ ডিসেম্বর ক্যালকাটা গেজেটের এক বিজ্ঞাপনে এই লটারির কথা জানা যায়। বাজারের আয় সেই সময়ে ছিল মাসে ৩৫০০ টাকা। বাজারের জমি ছিল ৯ বিঘা ৮ কাঠা। এর দাম ধার্য হয় এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা। চার্লস্ ওয়েস্টন কিনে নেন টিরেটার বাজার। চার্লস্ ওয়েস্টনকে কলকাতার প্রথম ফিরিঙ্গি বলা যায়। কলকাতাতেই তাঁর জন্ম। সেন্ট জন গীর্জার প্রাঙ্গণে সমাধিস্থলে ওয়েস্টনের সমাধি আছে। টেরিটি বাজারের উল্টোদিকের একটা বাড়িতে ১৭৩১ সালে ওয়েস্টনের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন মেয়র্স কোর্টের সেরেস্তাদার। কলকাতার লোকেরা তাঁকে বলত 'সায়েব সেরেস্তাদার।' তিনি পরিষ্কার বাংলায় কথা বলতেন। হিন্দুদের পুজোপার্বনেও যোগ

দিতেন। চার্লস্ ওয়েস্টন ছিলেন জোফানিয়া হলওয়েলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। হলওয়েল কলকাতা ছেড়ে যাবার সময় ওয়েস্টনকে সাত হাজার টাকা দিয়ে যান। সেই টাকাই তিনি লটারিতে দিয়েছিলেন। লটারিতে বাজার কিনে সেই বাজারের আয়ের টাকা তিনি দানধ্যানে ব্যয় করতেন। চুঁচুড়ায় চার্লস্ ওয়েস্টনের একটা বাগান বাড়ি ছিল। প্রতি মাসে সেখানে তিনি একশো মোহর (তখনকার ষোলশো টাকা) নিজের হাতে গরিবদের দান করতেন। বৌবাজারে ওয়েস্টন লেন তাঁরই স্মৃতি বহন করছে।

এরপর বেশ কয়েকটি লটারি খেলার টাকা দিয়ে কলকাতার নানা ধরনের উন্নতি ঘটানো হয়। ১৮০৫ সালে লটারির টাকায় তৈরি হয়
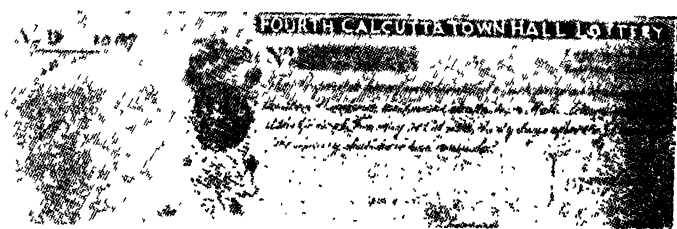
কলকাতার টাউন হলের লটারির টিকিট

টাউন হল। ১৮১৭ সালে লটারির টিকিট বিক্রির হিসেব থেকে দেখা যায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত। সেই টাকায় ইলিয়ট রোড, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, আমহার্স্ট রোড, কলেজ স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, মীর্জাপুর স্ট্রীট প্রভৃতি পথঘাট তৈরি হয়। এছাড়া বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ড্যানিয়েলের আঁকা ছবিও লটারিতে বিক্রি করা হত। লটারির টিকিটে তখনকার কলকাতার বাবুরা বাজার হাট কেনা বেচা করতেন।

১৮৩৮ সালের শেষ নাগাদ সুপ্রীম গভর্ণমেণ্টের নির্দেশে লটারি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

স্কুল

বাংলাদেশে কোম্পানির রাজত্ব পাকাপাকিভাবে স্থাপিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। ইংরেজরা মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড হাতে নিয়ে বুঝতে পেরেছিল ব্যবসা আর রাজ্যশাসন এই দুটো কাজের জন্যেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার দরকার। বাঙালী, বিশেষ করে ধনী বাঙালীরা তখন ইংরাজীর স্বাদ পেতে শুরু করেছে। সায়েবদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্যেও তখন ইংরাজী ভাষা শেখা একান্ত প্রয়োজন মনে মনে হতে লাগল। এর আগে শিক্ষায়তন বলতে টোল আর পাঠশালাকেই বোঝাতো।

বিশপ ওয়ার্ডের বইয়ে কলকাতার টোল আর টোলের অধ্যাপকদের একটা হিসেব পাওয়া যায়। এই হিসেবে দেখা যায় হাতিবাগানে অনন্তকুমার বিদ্যাবাগীশের টোলে পনেরজন ছাত্র, রামকুমার তর্কালংকারের টোলে আটজন, রামকৃষ্ণ বিদ্যালংকারের টোলে আটজন ছাত্র ছিল। বাগবাজারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি আর রাম কুমার শিরোমণির টোলে ছাত্র ছিল যথাক্রমে পনের, ছয় আর চারজন। এছাড়া টোল ছিল মলঙ্গা, তিরপাড়া, ইটালি, ঠনঠনে, হরতুকিবাগান, শিকদার বাগান, শোভাবাজার, টালা এইসব জায়গায়।

১৭৮৯ সালে কলকাতায় ফ্রী স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হাওড়ায় লেবেট সাহেবের একশো পঁয়ষট্টি বিঘে জমির ওপর পঁয়ষট্টি হাজার টাকায় বাড়ি কিনে ইংরেজ সৈন্যদের অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল তৈরি হয়েছিল।

কলকাতায় প্রথম বাঙালী স্কুল কলুটোলার রামজয় দত্তর স্কুল। ১৭৯১ সালে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। দেওয়ান রামকমল সেন ১৮০১

সালে এখানে ইংরাজী শিখতেন। রামকমল সেনের আমলে ইংরাজী অভিধান বা ব্যাকরণ ছিল না।

১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শেরবোর্ন সাহেবের স্কুল। এখনকার আদি ব্রাহ্মসমাজের বাড়ির কাছে শেরবোর্ন সাহেব এই স্কুল স্থাপন করেন। এখানে ছাত্র ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙালীরা।

আমড়াতলায় ১৭৮৬ সালে স্থাপিত হয় মার্টিন বাওলের স্কুল। মতিলাল শীল বাওলে সাহেবের স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

১৭৭৯ সালে মেয়েদের শিক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয় মিসেস ডারেলের স্কুল।

১৭৮১ সালে গ্রিফিথ সাহেব তাঁর বৈঠকখানার বাগান বাড়িতে বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের নাম ছিল গ্রিফিথ সাহেবের বোর্ডিং স্কুল।

আরাতুন পিক্রস নামে এক সাহেবের স্কুলের ছাত্র ছিলেম কৃষ্ণমোহন বসু আর রামরাম মিশ্র। কৃষ্ণমোহন বসু ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেবের শিক্ষক।

রামনারায়ণ মিত্র নামে একজন উকিলের মুহুরি জোড়াবাগানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুলের মাইনে ছিল চার টাকা থেকে ষোল টাকা পর্যন্ত। এখানে টমাস ডাইক্‌এর স্পেলিং বুক পড়ানো হত।

চিৎপুরে মহম্মদ রেজাখাঁর প্রাসাদের কাছে ১৭৮৪ সালে এক সাহেব স্থাপন করেছিলেন চিৎপুর বয়েজ বোর্ডিং স্কুল। এই স্কুলে ছাত্রদের খাওয়া পরা বাবদ মাসিক তিরিশ টাকা দিতে হত। যে সব ছাত্র শিক্ষকদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেত তাদের দিতে হত পঞ্চাশ টাকা। স্কুলে চোদ্দ জনের বেশি ছাত্র ভর্তি করা হত না।

১৮০০ সালে এক সাহেব ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি স্থাপন করেন। এখানে 'স্পেলিং বুক' আর 'স্কুল মাস্টার' পড়ানো হত। রাজা রাধাকান্ত দেব ছিলেন এই স্কুলের ছাত্র।

১৮০০ সালে হাটখোলায় রিড নামে এক সাহেব একটি স্কুল খোলেন। কোন্নগরের মহাত্মা শিবচন্দ্র বসু এখানে পড়তেন।

১৮০২ সালে আনন্দীরাম নামে এক ব্যক্তি তাঁর নিজের বাড়িতে হিন্দু ছাত্রদের পড়াবার জন্যে একটি স্কুল খুলেছিলেন। তিনি নিজেই এখানে পড়াতেন।

১৮১০ সালে ধর্মতলায় ডেভিড ড্রামণ্ড নামে এক সাহেব ধর্মতলা অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলকে ড্রামণ্ড অ্যাকাডেমিও বলা হত। ড্রামণ্ড সাহেব ছিলেন কুঁজো। তাই অনেকে এই স্কুলকে বলত কুঁজো সাহেবের স্কুল। এই স্কুলেই প্রথম ইংরাজী গ্রামার পড়ানো শুরু হয়। ডিরোজিও সাহেব ছিলেন ধর্মতলা অ্যাকাডেমিব একজন উজ্জ্বল ছাত্র।

১৮২০ সালে ম্যাকে সাহেব নিমতলা স্ট্রীটে যে স্কুল খোলেন সেখানে ভোলানাথ চন্দ্র ভর্তি হয়েছিলেন ইংরাজী শেখার জন্যে। কিন্তু ১৮৩০ সালের মধ্যেই স্কুলটি উঠে যায়। এছাড়া ১৮১৩ সালে বৈঠকখানায় হাটার ম্যান একটি স্কুল খুলেছিলেন। হাটারম্যান ছিলেন বহুভাষায় পণ্ডিত। সে যুগে কলকাতায় লাতিন আর গ্রীক ভাষায় তাঁর মত পণ্ডিত কেউ ছিলেন না।

১৮০০ সালে লণ্ডনের ঘড়ির ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ার আসেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে আজন্ম শিক্ষানুরাগী হেয়ার সাহেব ষোল বছর ব্যবসা করার পর শিক্ষাবিস্তারের দিকে মন দেন। তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত হয় ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি। তারপর থেকে হেয়ার স্কুল, হিন্দু কলেজ। কলকাতার শিক্ষাজীবনে তখন এসে গেছে এক নতুন জোয়ার। সেই জোয়ার ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতা থেকে সারা বাংলায়।
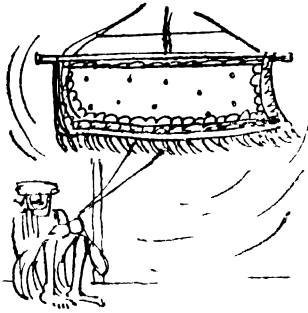
টানা পাখা

১৭৭৩ সালে কলকাতা সরকারীভাবে সারা ভারতের রাজধানীর মর্যাদা পেল। বছরে আড়াই লাখ টাকা মাইনে নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস এলেন কলকাতায় গভর্নর জেনারেল হয়ে। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল বা মন্ত্রণা সভায় ছিলেন চারজন। এঁদেরই একজন হলেন ফ্রানসিস ফিলিপ। ফ্রানসিসের সঙ্গে হেস্টিংসের যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয় তাতে হেরে গিয়ে ফ্রানসিস বিলেতে ফিরে যান। কলকাতা তখন এক বিচিত্র জায়গা। প্রচণ্ড গরম। দারুণ বৃষ্টি আর সেই সঙ্গে অসহ্য মশার কামড়। সায়েব সুবোরা ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ছে।

ফোর্ট উইলিয়মের ছোট খুপরি ঘরে কাজ করছে একটি ইউরেশিয় তরুণ কেরানী। দিনের বেলাতেই মশার কামড়ে সর্বাঙ্গ ফুলে উঠেছে। হঠাৎ ছেলেটি তার টেবিলের আধখানা কাঠ খুলে নিয়ে কড়িকাঠের বীমের সঙ্গে লাগিয়ে একটা মোটা দড়ি বেঁধে সেই দড়িটা বেয়ারার হাতে দিয়ে বললে—টান ব্যাটা এটা। ব্যস। টানা পাখা তৈরি হয়ে গেল কলকাতায়। গরমের হাত থেকে বাঁচার উপায়ও বেরিয়ে গেল।

টানা পাখার বিবরণ পাওয়া যায় মিস্ গোল্ডবোর্নের লেখায়। ফ্রানসিসের আমলে একটা নেমন্তন্ন বাড়ির বর্ণনা দিতে গিয়ে গোল্ডবোর্ন লিখেছেন—"খাওয়া দাওয়া শুরু হবার সময় থেকে কয়েকটি ছেলে পাখার মত কিছু জিনিস নিয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকত। খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু আরাম দিত।"

টানা পাখার কথা আছে এম এল গু গ্রাঁ প্রির লেখাতেও। গ্রাঁপ্রি ১৭৮৯ সালে বাংলা দেশে আসেন। তিনি লিখেছেন—"মাছির উপদ্রব

কমানো আর একটু হাওয়া খাওয়ার জন্যে অনেক বাড়িতে বেশ বড় ধরণের একটা পাখা কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো থাকত। এটা ছিল চৌকো। খাবার টেবিলের ঠিক ওপরেই ঝুলত পাখা। বাড়ির চাকর ঘরে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকত দড়ি টানার জন্যে।"

১৭৯২ সালের ক্যালকাটা ক্রনিকল্ পত্রিকায় টানা পাখার কথা পাওয়া যায়। সে সময় কলকাতার বিশিষ্ট ধনী আর রাজা জমিদারদের বাড়িতেই থাকত টানা পাখা। সাহেবদের বাড়িতে তো থাকতই। ১৮৪১ সালে ফ্যানি পার্কস কলকাতার টানা পাখা সম্পর্কে লেখেন—"ইংলণ্ড থেকে এসে যে কোন ইংরেজের নজরে যে জিনিসটা সবচেয়ে বিস্ময়কর বলে মনে হবে সেটা হল টানাপাখা। এই পাখা একটা বড় কাঠের ফ্রেমে কাপড় দিয়ে মোড়া। লম্বায় দশ, কুড়ি, তিরিশ ফুট কিংবা তার চেয়েও বড়। এই পাখা ঘরের ছাদ থেকে ঝোলানো থাকত।"

১৮৭০ সালের সাপ্তাহিক সুলভ সমাচারে লেখা হয়—'টানা পাখা টানিবার একটি নূতন কল হইয়াছে। কলিকাতার গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল তাহা ব্যবহার করিতেছেন। তাহা দ্বারা ৭।৮ খানি পাখা একেবারে টানা হয়। কল খরিদ করিতে এবং বসাইতে সমুদয়ে ২০০ টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু তাহার পরে আর কোন খরচ নাই। কলিকাতায় যে জলের কল হইয়াছে তাহারই সহিত যোগ করিয়া দিলে সেই কল চলিতে থাকে'।

কলেজ : বাংলা পাঠ্যবই

একশো বছর পার হয়ে গেছে। কলকাতা এখন রীতিমত ব্যস্ত শহর। হেস্টিংস, কর্নওয়ালিস আর জনশোরের পর গভর্নর জেনারেল বা লাটসাহেব হয়ে এলেন আর্ল অব মর্নিংটন ওরফে রিচার্ড ওয়েলেসলি। ১৭৯৮ সালে ওয়েলেসলি এলেন কলকাতায়।

সে সময় যে সব সাহেব সিভিলিয়ান বিলেতের হ্যালিবারি কলেজ থেকে পাশ করে এদেশে আসতেন তাঁদের এ দেশে এসেই সরকারী কাজে যেমন নানা জায়গায় যেতে হত তেমনি শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারও নিতে হত। কিন্তু সাহেবরা এদেশের ভাষা, সামাজিকতা আর দেশীয় লোকজনের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে কিছুই জানত না। সেই জন্যে কাজের অসুবিধে দেখা দিত হামেশাই। এমনও দেখা গেছে যে, অনেক জায়গায় না জেনেশুনে ইংরেজ সিভিলিয়ান ঘুষখোর কর্মচারীর পাল্লায় পড়েছেন। তাই বিচারের কাজে মারাত্মক ধরণের ভুল ভ্রান্তি ঘটত। ওয়েলেসলি এই সব অসুবিধে দেখে ঠিক করলেন কলকাতায় যে সব সিভিলিয়ান আসবেন তাদের কিছুদিন এ দেশের ভাষা শিখিয়ে তারপর কাজে পাঠানো হবে। সেই অনুযায়ী ১৮০০ সালে তিনি স্থাপন করলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। কলকাতার কলেজ নামক প্রথম শিক্ষায়তন। অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রোভোস্ট, ভাইস প্রোভোস্ট আর অধ্যাপক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কলেজের জন্যে ওয়েলেসলি গার্ডেনরীচ অঞ্চলে পাঁচখানা বাড়ি কেনেন। তার মধ্যে একটা বাড়ি ছিল উইলিয়ম বার্কের। কিন্তু সেখানে কলেজ স্থাপনের অসুবিধে দেখা দেওয়ায় কলকাতার কেন্দ্রস্থলে কলেজের জন্যে একটা

বড় বাড়ি লীজ নেওয়া হয়। বাড়িটা ছিল ম্যাকডোনাল্ড নামে একজন ব্যবসায়ীর। সেই বাড়িতে ১৮০০ সালে স্থাপিত হল ফোর্টউইলিয়ম কলেজ। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে কলকাতার কেল্লার পর কলেজের নামও হল।

হরিহর শেঠ বলেছেন—"এখন যেখানে রাইটার্স বিল্ডিংস আছে পূর্বেও এই স্থানেই উহা ছিল। সে বাটীও এতাদৃশ সুবৃহৎ ছিল; কিন্তু সৌন্দর্য্যে অনেকাংশে হীন ছিল। লর্ড ওয়েলেসলি যখন গভর্নর ছিলেন, তখন তিনি সিভিলিয়ান যুবকদের প্রথম এদেশে আসার পর একবৎসর ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে উপযুক্ত পণ্ডিত ও মুনসির নিকট ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সকল সিভিলিয়ান যুবকদের সুখ সুবিধার জন্যই প্রথম এই বাটীগুলি নির্মিত হইয়াছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের পর ইহাকে সংস্কৃত করিয়া সৌষ্টবসম্পন্ন করা হয়। ফোর্টউইলিয়ম কলেজ এই বাটীতেই ছিল। উহা উঠিয়া যাওয়ার পর উহাকে সরকারি অফিসে পরিণত করা হয়।"

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ছাত্ররা হোস্টেলে থাকত। খাবার টেবিলে প্রতিদিন প্রোভেস্ট আর ভাইস প্রোভোস্ট উপস্থিত থেকে ছাত্রদের খাওয়া দাওয়ার তদারক করতেন। কিন্তু কলেজ বেশিদিন টেঁকেনি। কোম্পানিব বড় কর্তারা একটা নোটিশ দিয়ে হঠাৎ জানিয়ে দিলেন এই কলেজ চালিয়ে অর্থব্যয় করার প্রয়োজন নেই। ওয়েলেসলি এই নির্দেশ মাথা পেতে নিলেন। কারণ ১৭৯৯ সালে টিপু সুলতানের পতনের পর কোলার জেলা মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কর্নওয়ালিশ একুশ দিন মহাবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে মহীশূরের নানদী দুর্গ দখল করেছিলেন। কোলার জেলা ওয়েলেসলিই মহীশূরের রাজাকে দান করেছিলেন। ১৮৭৬ সালে কোলারে সোনার খনির সন্ধান মিলল। কোম্পানি তো ওয়েলেসলির ওপর দারুন খাপ্পা। এতবড় একটা লোভনীয় জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেল। তাছাড়া ওয়েলেসলির আমলেই কোম্পানির দেনার সুদ তিনগুণ বেড়েছিল। এই সবের জন্যে কোম্পানির নির্দেশ

অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ওয়েলেসলির ছিল না। তাই ফোর্টউইলিয়ম কলেজ তুলে দেবার নির্দেশ তিনি মাথা পেতে নিয়েছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক ছিল না। ওয়েলেসলির উদ্যোগে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, উইলিয়ম কেরি, রাম রাম বসু, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা বই লিখতে শুরু করেন। এই সব বইয়ের মধ্যে কেরির বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত আর লিপি মালা, হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষ পরীক্ষা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের বত্রিশ সিংহাসন আর রাজাবলী, রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্র চরিত, চণ্ডীচরণ মুন্সির তোতা ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। ১৮০০ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে এই সব বই লেখা হয়। তবে বইয়ের ভাষা ছিল পার্সী শব্দে বোঝাই আর দুর্বোধ্য।

ফোর্টউইলিয়ম কলেজে গ্রীক আর লাতিন ভাষাও পড়ানো হত। তার সঙ্গে থাকত বিজ্ঞান সংক্রান্ত টুকিটাকি। কটন সাহেব তাঁর ক্যালকাটা ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ গ্রন্থে এই কলেজের বর্ণনা দিতে গিয়ে যা বলেছেন তার বাংলা মোটামুটি এই রকম—

'১৮০০ সালে ফোর্টউইলিয়ম কলেজ ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের দক্ষিণ দিকে কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটের কোণের বাড়িতে স্থাপিত হয়। এই বাড়িটি পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ম্যাকেঞ্জি লায়াল অ্যাণ্ড কোম্পানীর অধিকারে ছিল। বাড়িটি এক্সচেঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে বাড়িটি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি ভাড়া নিয়েছেন। উল্টোদিকের একটি বাড়িও (শীঘ্রই ভেঙে ফেলা হবে) কলেজের দখলে ছিল এবং রাস্তার এ পার ওপারে একটি গ্যালারিদ্বারা বাড়ি দুটি যুক্ত ছিল।'

কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নাম অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকবে। তবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই কলেজে চাকরি। বিদ্যাসাগর অতি অল্প বয়সে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হিসেবে

যোগ দেন। তখন এই পদে মাসিক মাইনে ছিল পঞ্চাশ টাকা। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন সায়েবদের বাংলা শেখাতে গেলে নিজেকে ইংরাজী শিখতেই হবে। তাই খুব অল্প দিনের মধ্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর অতুলনীয় মেধা বলে তিনি ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন।

১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর ফোর্টউইলিয়ম কলেজ ছেড়ে সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন। ১৮৪৭ সালে ফোর্টউইলিয়ম কলেজের ইংরেজ ছাত্রদের জন্যে তিনি রচনা করেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। এর দু'বছর পরে আবার তিনি আসেন ফোর্টউইলিয়ম কলেজের হেড ক্লার্ক হয়ে। তখন মাইনে ছিল মাসিক আশি টাকা। ১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছেড়ে আবার সংস্কৃত কলেজে যান।
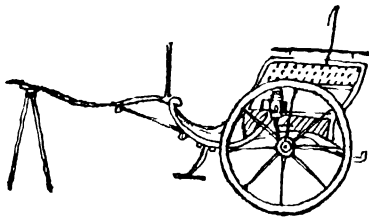
ঘোড়ার গাড়ি

উনিশশো একাশি। কলকাতার পিঠে ডানা লাগাবার কর্মযজ্ঞ চলছে। এখানে ওখানে রাস্তা বন্ধ। ক্রেন ড্রেজার আর ড্রিলিং মেশিনের আওয়াজ। দিনে রাতে কাজ চলছে অবিশ্রাম। কলির কলকাতার পাতাল প্রবেশ হবে রেল গাড়িতে।

কিন্তু শ'দেড়েক বছর কি তার একটু আগেও কলকাতার রাস্তায় হাতি চলত। হস্তিযান ছিল সেদিনের কলকাতার একটা প্রধান পরিবহন। অন্তত একশো ছিয়াত্তর বছর আগের কাগজের খবরে তার প্রমাণ মেলে। ১৭০৫ সালের ১৬ এপ্রিল বেঙ্গল হরকরার খবর ছিল এই রকম—'কয়েকদিন আগে একদিন সন্ধের সময় মিস্টার আর মিসেস হুটম্যান তাঁদের তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। এসপ্লানেড রোতে ট্যংকের ঠিক উল্টো দিকে একটা হাতিকে দেখে ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া ছুটো খেপে যায় এবং লাফাতে লাফাতে গিয়ে ব্র্যাডির বাড়ির পাশের নর্দমায় সওয়ারি সমেত গাড়িটা উল্টে দেয়।'

১৮০৫ সালেও ঘোড়ার গাড়ি ছিল কলকাতায়। তবে তেমন বেশি ছিল না। পালকিই ছিল তখনকার কলকাতার প্রধান যানবাহন। পালকি চড়ার একচেটিয়া অধিকার অবিশ্যি সাদা মানুষদেরই ছিল। এদেশের গরীব নেটিভদের পালকি চড়তে দেখলে রাজার দেশের লোকদের মর্যাদাহানি ঘটত। নেটিভরা শুধু কাঁধে পালকি বয়ে নিয়ে যাবে। এটাই ছিল ইংরেজদের আমলের আইন। ১৮২৭ সালে কিন্তু এই কলকাতা শহরে গরীব নেটিভরা সাহেবদের চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। পালকি বাহকদের তকমা পরতে হবে বলে সায়েবরা ফতোয়া জারি করলে উড়িয়া পালকি বাহকেরা তার প্রতিবাদে ধর্মঘট

করে। তামাম কলকাতায় একজন বাহকও সেদিন পালকি কাঁধে নেয়নি। সরকারী আইনের বিরুদ্ধে সেটাই হল কলকাতার শ্রমজীবীদের প্রথম ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের ফলে সাহেবমহলে ত্রাহিমধুসূদন ডাক পড়ে যায়। পালকি নাহলে তারা বেরুবে কি করে? নেটিভদের মত পায়ে হেঁটে তো আর কাজে যাওয়া যায় না। তাই পালকি বিহনে তখন দারুণ সমস্যা দেখা দিল। সেই সময় ব্রাউন লো নামে এক ইংরেজ এটা ওটা ভাবতে ভাবতে একদিন একটা পালকির নীচে দুটো চাকা লাগিয়ে সামনের হাতলে একটা ঘোড়া জুতে দিলেন। তৈরি হয়ে গেল ঘোড়ার গাড়ি। তাই প্রথম দিকের ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে নামকরা গাড়ির নাম ছিল ব্রাউন বেরি।

. আঠারো শতকের চল্লিশের দশক থেকেই কলকাতা শহরে ঘোড়ার গাড়ির যুগের শুরু বলা যায়। আর সেই থেকে গাড়িঘোড়া কথাটাও চলে আসছে। সে সময় বিলেত থেকে ঘোড়ার গাড়ির কারিগরেরা কলকাতায় আসতেন। ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট থেকে চাঁদনির মধ্যেই প্রধানত গড়ে ওঠে বড় বড় কোচ তৈরির কারখানা। শহরের এখানে ওখানে গড়ে ওঠে ঘোড়ার আস্তাবল আর ঘোড়ার জলখাবার জন্যে লোহার জলাধার। ১৭৯০ সালে কোম্পানির খাতায় চ্যাণ্ডলার, গ্রেনজ, স্টুয়ার্ট, ওয়াটসন প্রমুখ কোচমেকারের নাম পাওয়া যায়। এ ছাড়া ছিল বৌবাজারের ক্রিস্টোফার ডেক্সটারের বিশাল আস্তাবল। সবচেয়ে নামী কোচমেকার ছিলেন স্টুয়ার্ট। আঠার শতকের শেষ দিকে স্টুয়ার্টদের কারখানা গড়ে উঠেছিল ওল্ড কোর্ট হাউসের কোণে। ১৭৮৫ সালের জানুয়ারীতে ইণ্ডিয়া গেজেটে স্টুয়ার্ট কোম্পানির যে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল তার বাংলা এই রকম—'সুন্দর ভাবে মেরামত করা একটি ফিটন একজোড়া তেজি ঘোড়া সমেত বিক্রি হবে।'

তখনকার বিজ্ঞাপনে ঘোড়ার গাড়ির দাম দেখে মনে হয় ধনী সম্প্রদায় ছাড়া ঘোড়ার গাড়ি কেনার ক্ষমতা কারো ছিল না। কারণ দু' হাজার, আড়াই হাজার টাকা দামের গাড়ির বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখা

যেত। ঘোড়ার গাড়ির নামও ছিল সব বিচিত্র ধরনের—জুড়ি, ল্যাণ্ডো, চৌঘুড়ি, ল্যাণ্ডোলেট, ফিটন, ব্রাউন বেরি, ব্রুহাম, ছ্ঘুড়ি, আটঘুড়ি দশফুকার, বগি, সারা ব্যাঙ্ক, ডাক গাড়ি, জাউন গাড়ি আরো অনেক
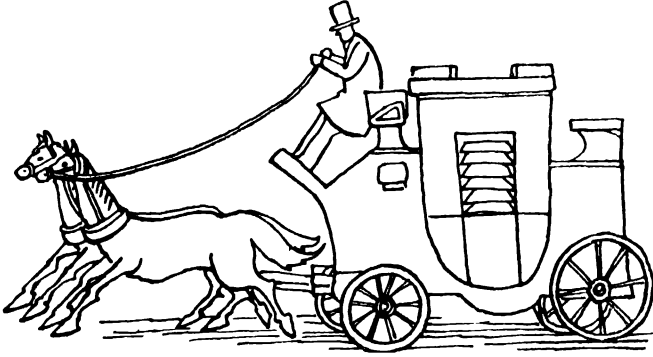
নাম। এক জোড়া ঘোড়া থাকলে জুড়ি, দুজোড়া—চৌঘুড়ি, তিনজোড়া—ছ'ঘুড়ি, চারজোড়া—আটঘুড়ি। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবরণে দেখা যায়—"ব্রুহাম গাড়ির আরোহীদের দেখিলে সকলের মনে একটা মহা 'সমীহ' ভাব জাগিয়া উঠিত—মনে হইত, না জানি আরোহী হাইকোর্টের কোন জজ বা মেডিকেল কলেজের কোন বড় ডাক্তার।"

এইসব ঘোড়ার গাড়ির আবার রকম ফের ছিল। ল্যাণ্ডো বা ব্রুহাম ভাড়া খাটত না। ভাড়ার গাড়ি হিসেবে পাওয়া যেত কেরাঞ্চি, পালকি গাড়ি, ব্রাউন বেরি, ছক্কোড় এই সব। কেরাঞ্চি গাড়িতে তখনকার দিনে কলকাতার সাধারণ মানুষ শেয়ারে যাতায়াত করত। এখনকার শেয়ার ট্যাক্সির মত। কেরাঞ্চি টানত দু'ঘোড়ায়। এই গাড়িতে জরাজীর্ণ ঘোড়া জুতে দেওয়া হত। বগি গাড়ির ওপরে থাকত ঢাকনা লাগানো। রোদের হাত থেকে সওয়ারীদের বাঁচাবার জন্যে। স্টুয়ার্ট কোম্পানির বগির নামই হয়ে গিয়েছিল স্টুয়ার্ট বগি। একটু অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্তরা বগি গাড়ি চাপতেন। কেরাঞ্চি আর ছক্কোড় ছিল চাকুরিজীবীদের গাড়ি।

গাড়ি আর ঘোড়া তখন মাসিক ভাড়ায় পাওয়া যেত। কুক অ্যাণ্ড কোম্পানিব বিজ্ঞাপনে দেখা যায়—একজোড়া ঘোড়া দৈনিক দশটাকা। মাসেব হিসেবে নিলে দেড়শো টাকা। একজনের গাড়ি আর একজোড়া ঘোড়া—দৈনিক ষোল টাকা। মাসের হিসেবে আড়াইশো টাকা। একটি ঘোড়া দৈনিক পাঁচ টাকা। মাসের হিসেবে—দেড়শো টাকা।

১৮৪৩ সালে একখানা বগি গাড়ির দাম ছিল আটশো থেকে এগারোশো টাকা। পালকি গাড়ির দাম ছিল ন'শো থেকে আঠারশো টাকা। বিলিতি ঘোড়াব দামও ছিল খুব বেশি। পাঁচশো টাকার কমে কোন ঘোড়া পাওয়া যেত না। তাও অতি সাধারণ ঘোড়া।

কলের জল

কলকাতার শুরুতে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল সেটা হল খাবার জল। কলকাতার এখানে সেখানে তখন পুকুরই ছিল জলের একমাত্র উৎস। কিন্তু সেই সব পুকুরের জল প্রায়ই দূষিত হয়ে উঠত। সায়েবরা তাই খাবার জলের জন্য চেষ্টা করতে লাগল। ১৭০৬ সালে কলকাতায় পাকাবাড়ি ছিল আটটা। কাঁচাবাড়ি ছিল আট হাজার। পুকুর ছিল সতেরটা। ১৭০৯ সালে লালদীঘি বা ট্যাঙ্ক স্কোয়ারকে ভাল করে কাটিয়ে স স্কার করে কেল্লা আর কাছারির সায়েবরা জলের ব্যবস্থা করে। তার আগে তারা জল খেত পুকুর আর গঙ্গা থেকে। শহর যত গড়ে উঠতে লাগল লোকসংখ্যা ততই বাড়তে লাগল। তাই শহরের নানা জায়গায় পুকুর কাটবার দায়িত্ব নিল শহর উন্নয়ন আর লটারি কমিটি। তৈরি হল কর্নওয়ালিশ স্কোয়ার বা হেদুয়া, ওয়েলিংটন স্কোয়ার বা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার বা গোলদীঘি, ওয়েলেসলি স্কোয়ার বা গোল তালাও। তবে আদি পুকুর লালদীঘি। লালদীঘির জলকে তখন লোকে বলত সায়েব পুকুরের জল।

১৮২০ সালে চাঁদপাল ঘাটে একটা পাম্প বসানো হয়েছিল। সেখান থেকে খোলা নর্দমার মধ্য দিয়ে জল সরবরাহ হত ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রীট, চিৎপুর, লালবাজার, বৌবাজারে। কলকাতার লোকেরা তখন কলসী নিয়ে নর্দমা থেকে জল তুলে বাড়িতে নিয়ে যেত। এছাড়া ভিস্তিওয়ালারা বাড়ি বাড়ি জল বেচতে আসত। বাড়ির গিন্নীরা জল কেনার আগে জেনে নিতেন সেই জল সায়েব পুকুরের কিনা। কারণ লালদীঘির জলই তখন ছিল সবচেয়ে ভাল। এদিকে ভিস্তিওয়ালারা

বেশির ভাগ সময়েই ধর্মতলার নর্দমার জল ভরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত সায়েব পুকুরের জল বলে। সামান্য জল নিয়েও তখন জালিয়াতি চলত কলকাতায়।

১৮৪৮ সাল। কলকাতা তখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভাল জলের সমস্যা তখনো মেটেনি। আইন তৈরি হল কলকাতায় জল সরবরাহ নিয়ে। বিশেষজ্ঞরা পলতা থেকে কলকাতায় জল সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিলেন। কাজ শুরু হল। মাটির নীচে লোহার পাইপ বসল আর সেই পাইপ গেল ড্যালহৌসী স্কোয়ার, লালবাজার, ধর্মতলা, চৌরঙ্গিতে। পলতার ৭২০ একর জমিতে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা হল। এটা অবশ্য ১৮৬৭ সালেব কথা। পলতার জল থিতিয়ে সেই জল এসে জমা হত টালা আর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। ১৮৭০ সালে নানা পরীক্ষার পর কলকাতায় জল সরবরাহ শুরু হয়। তখন দৈনিক ষাট লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ হত। কলকাতার লোকসংখ্যা তখন ছিল ৬ লক্ষ ৩২ হাজার। প্রতি হাজার গ্যালনে জল কর ছিল দশ টাকা। জল সরবরাহ শুরু হতেই কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় সিংহমুখওয়ালা কল বসে গেল। কল খুললেই জল। কলকাতার লোক অবাক হয়ে গেল।

পলতার পরিকল্পনা তৈরি করেন পৌরসভার সেক্রেটারি ডব্লু. সি. ক্লার্ক। এরপর ১৯০৯ সালে টালার জলের ট্যাঙ্ক তৈরির কাজ শুরু হয়। ১৯১১ সালের ১২ জানুয়ারী ট্যাঙ্ক তৈরি শেষ হয়। কিন্তু জল সরবরাহ শুরু হয় ১৬ মে থেকে। টালার ট্যাঙ্ক তৈরি করতে খরচ হয়েছিল তেইশ লক্ষ টাকা। এই ট্যাঙ্কে ৯০ লক্ষ গ্যালন জল ধরে। এরপর ১৯২৩ সালে টালা-পলতা জলসরবরাহ পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। কাজ শেষ হতে সময় লেগেছিল পনের বছর।
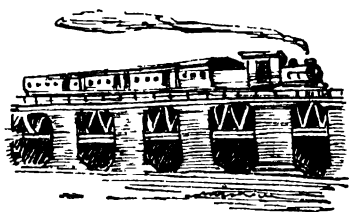
রেল

ভোর হতে না হতেই হাওড়া ষ্টেশনে ভিড় উপ্‌চে পড়ছে। নানা জায়গা থেকে লোক আসছে নৌকো চেপে, পায়ে হেঁটে। অবাক হয়ে তারা তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। মাটির ওপর চকচক করছে লোহাব লাইন। ঠিক যেন একটা কালো সাপ চলে গেছে এঁকে বেঁকে। এই লাইনের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি চলবে। কলকাতার প্রথম রেলগাড়ি। সাহেবরা তৈরী করেছে। এই গাড়িতে চড়ে হুস্‌হুস্‌ করে চলে যাওয়া যাবে অনেক দূরে। সাহেবরা ঘোরাফেরা করছে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে। পেছনে পেছনে ছুটছে বাঙালীবাবু, পেয়াদা, হুকুমবরদারেরা। সাহেব পেছনে ফিরে তাকালেই বাবু ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করছে—হোয়াট স্যার? ওয়াণ্ট সামথিং? প্রথম রেল চলবে বলে এই জায়গাটায় আটচালা বেঁধে তৈরী হয়েছে নড়বড়ে একটা ষ্টেশন।

খানিক পরেই ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বিশাল গাড়িটা এসে দাঁড়াল। পাইক-পেয়াদারা হটিয়ে দিল সকলকে বেশ খানিকটা তফাতে। দৈত্যের মত ফুঁসতে ফুঁসতে গাড়িটা এসে দাঁড়াল। মুখের ওপর একটা বড় নলের ভেতর থেকে ভক্‌ ভক্‌ করে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ভিড়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন একজন সাহেব। তারপর সমবেত লোকজনের উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটি ভাষণ দিলেন। জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকা জনৈক বাঙালী বাবু কৃতার্থ হয়ে বাংলা ভাষায় সাহেবের ভাষণের রূপান্তর ঘটিয়ে যা বললেন তা হল—'এই যে গাড়ি তোমরা দেখছ এর নাম ট্রেন। আমাদের দেশের এক সুসন্তান জর্জ ষ্টিভেনশন এই ট্রেন আবিষ্কার করেছে। ট্রেন চললে তোমরা অতি সহজে, অল্প সময়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারবে।' সাহেবের ভাষণের শেষে জনা

কয়েক ইংরেজ সমবেত গলায় গাইতে লাগল "রুল ব্রিটানিয়া"। সেই বাঙালী বাবুটিও চোখ বুজে পরমানন্দে সাহেবদের গলায় গলা মিলিয়ে সিংহের শাসনের প্রশস্তি গাইতে লাগলেন। গান শেষ হল। হাততালি পড়ল। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল একজন লোক। খালি গা, পরনে গরদের ধুতি। গলায় ঝকঝকে সাদা পৈতে। হাতে তামার পাত্রে ফুল-চন্দন আর একটা বিরাট মালা। হেড পেয়াদার কাছে গিয়ে অনুনয়-বিনয় করে কী সব বললে সেই লোকটা। পেয়াদা তাকে নিয়ে গেল সাহেবের কাছে। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। শেষে সাহেব একটু হেসে ব্রাহ্মণের অনুরোধ রাখলেন। গর্বিত ব্রাহ্মণ হেড পেয়াদার পিছু পিছু বুক ফুলিয়ে হেঁটে গিয়ে একেবারে ইঞ্জিনের মাথায় মালাটা পরিয়ে দিল। তারপর ফুল আর চন্দন দিয়ে পুজো করল রেল গাড়িকে। পুজো সারা হলে নেমে এসে তেমনি সদর্পে ভীড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। সামনের সারির লোকজন তখন কাঁসর-ঘণ্টা আর শাঁখ বাজাতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত ট্রেন ছাড়ল বাঁশি বাজিয়ে। কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ ডুবে গেল ইঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জনে। কলকাতার প্রথম ট্রেন ছাড়ল ১৮৫৪ সালের ১৫ আগষ্ট সকাল সাড়ে আটটায়। গন্তব্যস্থল ২৪ মাইল দূরে হুগলি।

১৮৪৪ সালে রোলাণ্ড ম্যাকডোনাল্ড ষ্টিফেনসন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে লণ্ডনে এই কোম্পানীর গোড়াপত্তন করেন। ১৮৪৫-৪৬ সালে তিনি কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত ঘুরে রেলপথ তৈরী সম্পর্কে একটা মোটামুটি জরীপ করে লণ্ডনে ফিরে যান এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন। বছর তিনেক আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হয় রাণীগঞ্জ পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে রেললাইন তৈরী করা হবে। কলকাতায় তখন রেলগাড়ির হাওয়া বইছে। কবে রেল চলবে এই ছিল রাজধানী কলকাতার একমাত্র আলোচনার বিষয়। ১,৫০০,০০০ পাউণ্ড মূলধনে কলকাতা থেকে ভগবানগোলা পর্যন্ত রেললাইন তৈরীর একটি প্রকল্পও রচিত হয়। যে কোম্পানি এই প্রকল্প

রচনা করেছিল তার নাম ছিল সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি। কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি টাকা দিয়েছিলেন এই প্রকল্পের জন্যে। তখনকার দিনের কলকাতার খবরের কাগজের রিপোর্টে জানা যায় সেই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মিলিত হয়েছিলেন টাউন হলে এ ব্যাপারে পাকা সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উদ্যোক্তাদের আর আর হদিস পাওয়া যায়নি। সংগৃহীত টাকা পয়সারও পাত্তা মেলেনি।

১৮৪৯ সালের ১২ এপ্রিল সংবাদ ভাস্করের প্রথম সংখ্যায় রেলপথ পরিকল্পনা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—'বিলাতি সমাচার পত্রের লেখক কোর্ট অফ ডাইরেক্টরের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা মনস্থ করিয়াছেন, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা কলিকাতা হইতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এক কোটি মুদ্রাব্যয়ে এক লৌহময় পথ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপ-করণাদি পরীক্ষা করিলে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহাদিগকে উচিতমত সাহায্য প্রদান করিতে
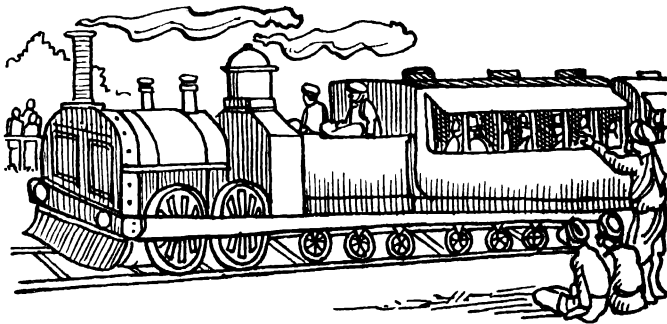
পারেন অতএব ব্যক্ত হইয়াছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি নামক বণিক সম্প্রদায় যাঁহারা ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার সম্পূর্ণ উদ্যোগ করিয়া বিলাতায় রাজপুরুষগণের বিশেষানুকূল্যাভাবে তাহাতে বিরত হন। তাঁহারাই পুনঃ প্রবৃত্ত হইতে বাসনা করিয়াছেন, কিন্তু ডাইরেক্টর মহাশয়েরা কিরূপে সাহায্য করিবেন এবং সে সাহায্য

দ্বারা তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কিনা, ইহা স্থির করিয়া যথা-বিহিত করিবেন'।

১৮৫৩ সালের শেষ নাগাদ ষ্টিফেনসন সাহেব পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেললাইন তৈরীর নক্সা সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দু'টি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় এই কাজ এক বছর পিছিয়ে যায়। রেলের বগীর প্রথম মডেল যে জাহাজে আসছিল সেই 'এইচ এম এস গুড্উইন' জাহাজটি স্যাণ্ড হেডস্‌এ ডুবে যায়। দ্বিতীয় ঘটনা হল 'ডেকাগ্রি' জাহাজে রেলের ইঞ্জিন আসছিল। কিন্তু কলকাতায় না পৌঁছে সেই জাহাজ ভুলক্রমে অষ্ট্রেলিয়া চলে যায়। এ ছাড়া ফরাসী চন্দননগরও ছিল একটা জটিল সমস্যা। তখনো ফরাসী সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। রেল লাইন ফরাসী অঞ্চলে ঢুকে যেতে পারে বলে এটা একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। গাড়ীর মডেল হাতছাড়া হওয়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের চীফ লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার জন হগ্‌সন কলকাতাতেই বগী তৈরীর কাজ শুরু করলেন। কলকাতাব ষ্টুয়ার্ড অ্যাণ্ড কোম্পানি এবং সেটন অ্যাণ্ড কোম্পানিকে নিযুক্ত করা হল রেলের বগী তৈরীব কাজে। ইতিমধ্যে ইঞ্জিন নিয়ে ডেকাগ্রি জাহাজ ১৮৫৪ সালে অষ্ট্রেলিয়া হয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছল। ঐ বছরের ২৮ জুন হগসন হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত সেই ইঞ্জিন চালালেন পরীক্ষামূলক-ভাবে। অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে হুগলী পর্যন্তই প্রথম রেল চলে। তারপর ১৮৫৪ সালে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেল চালানো হয়। ১৮৫৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত লাইন খোলা হয়।

তখনকার দিনে কলকাতা থেকে হাওড়া যেতে হত নৌকোয়। বহু বছর পরে স্যার ব্র্যাডফোর্ড লেসলি ভাসমান পণ্টুন তৈরী করান। এই এই পণ্টুনের ওপর দিয়েই গাড়িঘোড়া চলত। হাওড়া ছিল তখন গ্রামেরই মত। এখন যেখানে ষ্টেশন, সে সময়ে সেখানে ছিল রেলের

পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেলের প্রথম টাইম টেবিল

[১৮৫৪ সালের ২৬ অক্টোবরের সংবাদ ভাস্করে প্রকাশিত]

কলিকাতা হইতে	প্রাতের শকট	বিকালের শকট	পাণ্ডুয়া হইতে	প্রাতের শকট	বিকালের শকট
হাবড়া ষ্টেশন হইতে গমন	১০-৩০	৫-৩০	পাণ্ডুয়া হইতে গমন	৭-৩০	২-৩০
বালি	১০-৪৫	৫-৪৫	মগরা	৭-৫৫	২-৫৫
শ্রীরামপুর	১১-৩	৬ ৩	হুগলী	৮-১২	৩-১২
চন্দননগর	১১-৩০	৬-৩০	চন্দননগর	৮-৩০	৩-৩০
হুগলী	১১-৪০	৬.৫৩	শ্রীরামপুর	৮-৫১	৩-৫১
মগরা	১১-৫৮	৬-৫৮	বালি	৯-৯	৪-৯
পাণ্ডুয়া পৌছন	১২-৩০	৭-৪০	হাবড়া পৌছন	৯-৩০	৪-৩০

যন্ত্রপাতি শেড আর বগী তৈরীর কারখানা। এখানেই তৈরী হয়েছিল একটা অস্থায়ী ষ্টেশন। হোগলার ঘরের ছোট জানলা ছিল বুকিং কাউন্টার।

আজ ভাবতেও অবাক লাগে রেল চলার ব্যাপারে এ দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিলেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রমেশচন্দ্র দত্ত মনে করতেন রেললাইন পেতে ট্রেন চালানোর সমস্ত কাজটাই হবে অর্থের অপব্যয়। তাঁর মতে ইংরেজরা ভারতের

জনসাধারণের প্রয়োজনের কথা না বুঝেই এদেশে রেল চালাচ্ছে। স্যার আর্থার কটনের মত লোকও মনে করতেন রেল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

প্রথম ট্রেনে চড়বার জন্য হাজার হাজার দরখাস্ত পড়েছিল। দরখাস্ত বাছাই করে মাত্র কয়েকশো লোককে মনোনীত করা হয় প্রথম ট্রেনের যাত্রী হিসাবে। হাওড়া থেকে হুগলীর প্রথম ট্রেনে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ১৫ আগষ্ট সকাল সাড়ে আটটায় ট্রেনটি ছেড়ে হুগলী পৌঁছেছিল তিন ঘণ্টা এক মিনিটে। প্রথম ট্রেনে ছিল তিনটি প্রথম শ্রেণী, দু'টি দ্বিতীয় শ্রেণী, আর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য তিনটি ট্রাক, গার্ড সাহেবের জন্য একটি ব্রেক ভ্যান। এ সবই ছিল এদেশে তৈবী। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ছিল তিন টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর স।ত আনা।

রেল লাইন উদ্‌বোধনের আনুষ্ঠানিক উৎসব হয় ১৮৫৫ সালেব ৩ ফেব্রুয়ারী, শনিবার। বর্ধমানে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ড্যালহৌসি অসুস্থতার দরুণ উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে যেতে পারেননি। কিন্তু হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় এক হাজার ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। হাওড়া ষ্টেশনের অনুষ্ঠানের পর তাঁরা দুখানি ট্রেনে বর্ধমান রওনা হন। ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে সেই ট্রেন পৌঁছেছিল বর্ধমানে। বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় এই ট্রেন ছাড়ার খবরে লেখা হয়েছিল—'অনেক বড় বড় সাহেব তামাসা দেখিতে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ১ জানুয়ারি সোমবার (১২৬১ বঙ্গাব্দে ১৮ পৌষ) দিবস হইতে দস্তুর মত ট্রেন চলিয়াছিল।'

পৌর বাজার

১৮৭৩-৭৪ সাল। কলকাতার প্রথম গণপ্রতিরোধ। একদিকে স্যার চার্লস স্টুয়ার্ট হগের পুলিশ বাহিনী অন্যদিকে বাবু হীরালাল শীলের বাজারের খেটে খাওয়া সব্জিওয়ালা আর শীলবাবুর লাঠিয়াল বাহিনী। হগ সাহেব একে সাহেব তার ওপর আবার পুলিশ কমিশনার। এছাড়া তিনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। সুতরাং তাঁকে আর পায় কে। বাঘ আর গরুকে একঘাটে জল খাওয়ানোই তো তাঁর কাজ। অন্য দিকে হীরালাল শীল কলকাতার ডাকসাইটে ধনী আর সে যুগের দরিদ্র-বান্ধব হিসেবে খ্যাতিমান মতিশীলের ছেলে। টাকা আর লোকবল কোনটারই অভাব নেই তাঁর। ধর্মতলায় তাঁর বিশাল বাজার। শীলবাবুর বাজার নামে পরিচিত। হগ সাহেব অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলেন সায়েবদের জন্যে একটা বাজার তৈরি করবার। নেটিভদের বাজারে ঢুকতে সায়েবদের ঘেন্না করে। কাঁহাতক আর নাকে রুমাল দিয়ে বাজার করা যায়। তাই সায়েবদের নিজস্ব বাজার দরকার। আর তিনি খোদ যখন মিউনিসিপ্যালিটির মাথা তখন মিউনিসিপ্যালিটির বাজারই হোক সায়েবদের জন্যে। এই সব ভেবে হগ সায়েব জায়গা খুঁজতে লাগলেন। নজরে পড়ল হীরালাল শীলের বাজার। মনে মনে হগ সায়েব বলে উঠলেন 'ইউরেকা। আর চিন্তা নেই।' ঐ বাজার তুলে দিয়ে ওখানেই বসাতে হবে নতুন বাজার বা নিউ মার্কেট। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ পেয়াদা গেল শীলবাবুর বাজারের লোকজনকে উচ্ছেদ করতে। কিন্তু অত সহজ নয় ব্যাপারটা। শীলবাবু ওসব পুলিশ কমিশনার বা চেয়ারম্যানের তোয়াক্কা করেন না। তিনি তাঁর লাঠিয়াল

বাহিনীকে বললেন—পুলিশ এলেই লাঠি চালাবি তোরা। শুরু হয়ে গেল বাজারের লড়াই। রোজই পুলিশ আসে আর শীলবাবুর লেঠেলদের সঙ্গে তাদের লড়াই হয়।

এই বাজারের লড়াই তখন এমনই জমে উঠেছিল যে সেই লড়াই নিয়ে একখানা নাটক লিখেছিলেন শিশির কুমার ঘোষ। নাটকের নাম
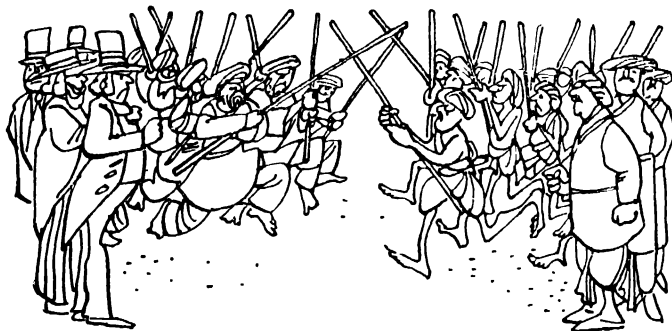
ছিল 'দি ব্যাটল আব দি মার্কেটস' বা বাজারের লড়াই। এ ছাড়া আরো একখানা নাটক লেখা হয়েছিল 'গ্রেট মার্কেট ওয়ার' নাম দিয়ে। নাট্যকার ছিলেন সুরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু শিশির কুমারের নাটকটাই ধর্মতলায় অভিনীত হত। রোজ সন্ধে হতে না হতেই কাছাকাছি একটা থিয়েটারে অভিনীত হত শিশির কুমারের এই প্রহসন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সায়েব হগেরই জয় হল। বেআইনী ভাবে বাজার দখলের চেষ্টার অভিযোগ এনে হীরালাল শীল হগ সায়েবের বিরুদ্ধে মামলা করেন। এই মামলা প্রসঙ্গে ১৮৭৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—'শুনা যাইতেছে নূতন মিউনিসিপ্যাল বাজার খোলাতে ধর্মতলার বাজারের অধ্যক্ষ বাবু হীরালাল শীল জাস্টিস্ দিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন। ভাল ভাল আইনজ্ঞ লোক তাঁহাকে নালীশ করিবার জন্য পরামর্শ দিতেছেন।' ১৮৭৩ সালে সুলভ সমাচার লেখেন—'ভাল বাজারের জন্য কলিকাতা মিউনিসি-

প্যালিটির ব্যয়ে একটি প্রকাণ্ড ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু বাবু হীরালাল শীলের ধর্মতলার বাজারের সহিত ইহার টক্কর লাগিয়া গিয়াছে। হীরালাল শীল পুলিশ কমিশনার হগ সাহেবের নামে একলক্ষ টাকার দাবীতে হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছেন।' শেষ পর্যন্ত অবশ্য সাতলক্ষ টাকায় হীরালাল শীলের বাজারটি বিক্রি করা হয় মিউনিসিপ্যালিটির কাছে। হীরালালবাবু কতকটা বাধ্য হয়েই বাজার বিক্রি করে দেন। ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টাউন হলে জাস্টিস অব পিস্‌দের বৈঠকে সাতলক্ষ টাকায় ধর্মতলার বাজার কিনে নেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একজন দেশী লোককে এইভাবে পরাস্ত করে তাঁর ন্যায়সঙ্গত অধিকার কেড়ে নেবার বিরুদ্ধে তখন অনেকেই সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু সেকালের কলকাতার ধনী আর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তখন সায়েব বলতে অজ্ঞান। তাই টাউন হলের সভায় বাজার কেনার প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছিলেন রাজা রমানাথ ঠাকুর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র আর কৃষ্ণদাস পাল। এইভাবেই কলকাতার প্রথম গণ প্রতিরোধকে উপেক্ষা করে এদেশের ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজরা ১৮৭৪ সালের ১ জানুয়ারী উদ্‌বোধন করল কলকাতার প্রথম পৌর বাজার নিউ মার্কেটের।

ক্রিকেট

নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ছিলেন সর্বগুণের অধিকারী। কলকাতার ফুটবলের গোড়াপত্তন যেমন তাঁর হাতে তেমনি কলকাতার ক্রিকেটও জন্মলগ্ন থেকেই লালিত হয়েছে নগেন্দ্রপ্রসাদের আন্তরিক মমতায়।

ক্রিকেটের তোড়জোড়টা অবশ্য প্রথম দেখা যায় বোম্বাইয়ে। সে কথা শুনেই কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা ১৮৭৭ সালে ছোট্ট একটা দল তৈরি করে প্রেসিডেন্সি কলেজ আর হেয়ার স্কুলের মাঠে শুরু করে কলকাতার প্রথম ক্রিকেট। দলের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। তিনি তখন স্যার নন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। দেবপ্রসাদের সহযোগী ছিলেন ত্রিগুণাচরণ সেন আর হরিচরণ সেন। হরিচরণ সেন পরে ডাক্তার হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁরই ছেলে বিখ্যাত ব্যারিস্টার এস. কে. সেন।

দল তৈরি হল। খেলার সরঞ্জাম এল। আলেকজাণ্ডার ব্যাট আর কমপোজিশন বল। প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠের রেলিংয়ের ওপাশে ভিড়ে ভিড়। নিয়মকানুন নেই। বল ছুঁড়ে দিচ্ছে একজন আর অন্য প্রান্তে ব্যাট নিয়ে আর এক খেলোয়াড় মোকাবিলা করছে বলের।

প্রেসিডেন্সির দেখাদেখি হেয়ার স্কুলের ছাত্ররাও ক্রিকেট শুরু করে দিল। শুধু শুরু করল না রীতিমত একটা ক্লাব তৈরি করল। সেই ক্লাবের নাম হল বয়েজ ক্লাব। বাংলাদেশে বয়েজ ক্লাবই প্রথম স্পোর্টিং

ক্লাব। ১৮৮০ সালে বয়েজ ক্লাবের জন্ম। প্রতিষ্ঠাতা দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ছোট ভাই সে সময়কার হেয়ার স্কুলের ফোর্থ ক্লাসের ছাত্র নগেন্দ্রপ্রসাদ। বয়েজ ক্লাব টিঁকে ছিল ১৮৮৬ পর্যন্ত। ১৮৮৭ সালে এই ক্লাব শোভাবাজার ক্লাবের সঙ্গে মিশে যায়। এই ক'বছরে বয়েজ ক্লাব খেলেছিল সতেরটা ম্যাচ। গৌরবের কথা এই যে, সতেরটা খেলাতেই ক্লাব জয়ী হয়েছিল।

বয়েজ ক্লাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ১৮৮০ সালেই জন্ম নেয় হাওড়া ক্রিকেট ক্লাব। পরে এর নাম হয় হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাব। ক্রিকেটে দারুণ সুনাম পেয়েছিল এই ক্লাব। এর কর্ণধার ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডুর ছেলে বামাচরণ কুণ্ডু। বামাচরণের ব্যাটিং ছিল অনবদ্য। দলের বোলার ভূতনাথ চন্দ্রের বলকে তখনকার দিনের গোরা খেলোয়াড়েরাও সমীহ করে চলত। এছাড়া হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাবের নামী খেলোয়াড় ছিলেন মহিম দত্ত, মাস্টার, জটাধারী প্রমুখ।

১৮৮১ সালে নগেন্দ্রপ্রসাদ বৌবাজারের অক্ষয় দাস আর অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে গড়ে তোলেন ওয়েলিংটন ক্লাব। ময়দানে এখনকার টাউন ক্লাবের জমিতে ছিল ওয়েলিংটন ক্লাবের মাঠ। ময়দানে বাঙালীর ক্লাব বলতে এটাই প্রথম। ক্লাবের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন ছিলেন অক্ষয় দাস। ১৮৮৩ সালে ওয়েলিংটন ক্লাব উঠে যায়।

নগেন্দ্রপ্রসাদ বয়েজ ক্লাব, হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাব আর ওয়েলিংটন ক্লাবের সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়ে তুললেন প্রেসিডেন্সি ক্লাব। প্রেসিডেন্সি ক্লাবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৮৫ সালে ইডেনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিকেট খেলা। বিদেশী দলের সেটাই ভারতে প্রথম খেলা। সেই খেলায় কলকাতার খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন নগেন্দ্রপ্রসাদ (ক্যাপ্টেন), হরিদাস শীল (সেণ্ট জেভিয়ার্স), এস. ব্যানার্জী (হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ন), লালচাঁদ বড়াল (সুবিখ্যাত গায়ক, রাইচাঁদ বড়ালের বাবা), অক্ষয় দাস (ওয়েলিংটন), মণি সেন (প্রেসিডেন্সি), বামাচরণ কুণ্ডু (হাওড়া স্পোর্টিং), রামকানাই, মোনা

বসু (মেডিকেল কলেজ), হরি চ্যাটার্জী আর হর চ্যাটার্জী (কৃষ্ণনগর কলেজ)। সেদিনেব খেলা ড্র হয়েছিল। মাঠে উপস্থিত ছিলেন দাদাভাই নৌবজি, সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিস্টাব হিউম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে ওয়েলিংটন ক্লাব উঠে যায়। এরপর অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত আর চারুচন্দ্র মিত্র উদ্যোগী হয়ে স্থাপন কবেন টাউন ক্লাব। পবে এই ক্লাবে আসেন অধ্যাপক সারদাবঞ্জন বায় আর তাঁব ভাই যতীন্দ্র, মুক্তিদা, কুলদা ও প্রমদা। ময়মনসিংহের গৌবীপুরেব জমিদাব ব্রজেন্দ্রকিশোব বায়চৌধুবীও ছিলেন টাউন ক্লাবেব সভ্য।

তখনকার কলকাতার কাগজে ক্রিকেট খেলার খবরে বিচিত্র সব প্রতিশব্দ দেখা যেত। সেঞ্চুরীকে বলা হত—শতমাব। বোলার—বলন্দাজ। ব্যাটসম্যান—ব্যাটমদাব। বোলিং আর ব্যাটিং—বলন্দাজী আব ব্যাটমদারী। ওভাব হ্যাণ্ড বোলিং—উর্ধ্ববাহু বলন্দাজী। আণ্ডার হ্যাণ্ড—নিম্নবাহু। গোড়ার দিকে বল দেওয়া হত আণ্ডার হ্যাণ্ড। নগেন্দ্রপ্রসাদই কলকাতায় ওভারহ্যাণ্ড বলের প্রচলন করেন।

আজকের গড়ের মাঠ বা ময়দান একদিন ছিল পুকুর আর ডোবা। তার চারপাশে ছিল ঘন জঙ্গল। এই গোটা অঞ্চলেব ১১৭৮ বিঘা জমির মধ্যে মানুষ বাস করত মাত্র সাতান্ন বিঘায়। আজকের গড়ের মাঠ তখন ছিল গোবিন্দপুর গ্রাম।

নতুন কেল্লা তৈরির জন্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গোবিন্দপুর গ্রাম দখল করে। গ্রামের লোকজন তখন চলে আসে উত্তর অঞ্চলে। তাদের কিছু কিছু জমি আর ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয়। নতুন দুর্গ তৈরির সময় কাছাকাছি জায়গার জঙ্গল সাফ করা হয়। পুকুরগুলো বুজিয়ে তৈরি হয় মাঠ। গড়ের গায়ে লাগানো মাঠ। তাই গড়ের মাঠ। এই মাঠেই কলকাতার প্রথম ক্রিকেট খেলা হয় ১৮০৪ সালের ১৮ আর ১৯ জানুয়ারি। সেই খেলা হয়েছিল ইটোনিয়াম সিভিল সার্ভেণ্ট আর

ইংরেজ জেন্টলম্যানদের মধ্যে। গোরাদের খেলায় দেশীয়রা তখনো অচ্ছুৎ। তারপর ১৮২৫ সালে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের পত্তনের পর এখানে ক্রিকেট খেলা শুরু হয় নিয়মিতভাবে। তখন ইডেন গার্ডেন হয়নি। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব ১৮৪১ সালে খেলার মাঠ সংরক্ষণের জন্যে চারপাশে বাঁশের বেড়া দেবার অনুমতি পেয়েছিল ফোর্ট উইলিয়মের কাছ থেকে। তখন গ্যালারি ছিল না, প্যাভিলিয়ন ছিল না। খেলা দেখতে হত খড়ের ছাউনির ঘরে দাঁড়িয়ে। ১৮৪০ সালে লর্ড অকল্যাণ্ড এসপ্ল্যানেডের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা বাগান তৈরি করান। এর আদি নাম ছিল অকল্যাণ্ড সার্কাস গার্ডেন। পরে অকল্যাণ্ডের পারিবারিক পদবি ইডেন থেকে বাগানের নামও হয় ইডেন গার্ডেন।

ফুটবল

দশবছরের ছেলে নগেন একদিন তার মার সঙ্গে গঙ্গাস্নান সেরে ফিরছে। ঘোড়ার গাড়িটা কিংসওয়ে দিয়ে আসার সময় নগেন অবাক হয়ে দেখল কতকগুলো গোরা একটা চামড়ার বল নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করে খেলছে। এই ধরনের খেলা নগেন আগে কখনো দেখেনি।

এই নগেনই কলকাতার ফুটবলের জনক নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী। তখনকার দিনের নামকরা ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারীর ছেলে। ১৮৭৮ সালে সেই গঙ্গাস্নানের দিনে দেখা সায়েবদের খেলাই নগেন্দ্র প্রসাদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়াল। পরের দিন হেয়ারস্কুলের ক্লাশে এসে নগেন্দ্রপ্রসাদ বন্ধুদের কাছে গল্প করলেন সেই বিচিত্র বল খেলা দেখার কথা। ছেলেরা ঠিক করল মাষ্টারমশাইদের কানে না তুলে নিজেরা চাঁদা তুলে বল কিনবে। তিবিশ টাকা চাঁদা উঠল। চৌরঙ্গির একটা দোকানে গেল ছেলেরা। দোকানের ইওরোপীয়ান সেলসম্যানকে নগেন্দ্রপ্রসাদ হাত দিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন তিনি কী চান। সায়েব তখন টেবিলের ওপর বল এনে রাখল। ছেলেদের আর সবুর সইছে না। এক্ষুনি বলটা নিয়ে মাঠে নামতে পারলে হয়। কিন্তু দাম শুনে মুখ শুকিয়ে গেল তাদের। পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল তারা। ওদের অবস্থা দেখে সায়েবের কেমন যেন মায়া হল। তিরিশ টাকাতেই বলটা দিয়ে দিল ছেলেদের। প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে হেয়ার স্কুলের মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলেরা। দলপতি নগেন্দ্রপ্রসাদ।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মিঃ স্ট্যাক দেখলেন স্কুলের ছেলেরা একটা বল নিয়ে এলোপাথাড়ি ছুটছে। তিনি মাঠে ঢুকে ছেলেদের

ডেকে তাদের ফুটবল খেলার সমস্ত নিয়ম কানুন বুঝিয়ে দিলেন। এরপর একদিন অধ্যাপক স্ট্যাক একটা ফুটবল আর ফুটবল খেলার নিয়ম-কানুনের একখানা বই উপহার দিলেন নগেন্দ্র প্রসাদকে। নিয়মকানুন শিখে হেয়ার স্কুলের ছেলেরা যেদিন প্রথম দুদলে ভাগ হয়ে স্কুলের মাঠে খেলতে নামল সেদিন মাঠে আর রাস্তায় লোক ভেঙে পড়ল। কলেজ স্ট্রীট লোকে লোকারণ্য। এমন খেলা আগে কখনো দেখা যায় নি।

এরপর নগেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে হেয়ার স্কুলে ফুটবল খেলা একটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু কলকাতার প্রথম ফুটবল খেলা হয়েছিল কলকাতার এসপ্লানেড মাঠে ১৮৫৩ সালে। খেলা হয়েছিল ব্যারাকপুরের একদল ইংরেজের সঙ্গে কলকাতার সিভিলিয়ানদের ক্লাবের। এর পর থেকে মাঝে মধ্যে ইংরাজরা নিজেদের মধ্যে ফুটবল খেলত কলকাতায়।

ট্রাম

সেদিন শিয়ালদার রাস্তার দু'-ধারে ভিড় উপচে পড়ছে। একটা নতুন ধরনের গাড়ি চলবে। গাড়িটা ঘোড়ায় টানে। রেল লাইনের মত লাইন দিয়ে ছুটে যাবে এই গাড়ি শিয়ালদা থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট। গাড়িটার দু'টো কামরা—ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেণ্ড ক্লাস। ফার্স্ট ক্লাসে রয়েছে পাঁচজন যাত্রী। তিনজন সায়েব আর দু'জন এদেশী। কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসে তিল ধারণের জায়গা নেই। গাড়ি টানবে একজোড়া তেজী অস্ট্রেলিয়ান ওয়েলার ঘোড়া। সংকেত দেবার সঙ্গে সঙ্গে চাবুক পড়ল ওয়েলার দু'টোর পিঠে। কিন্তু ঘোড়া দু'টো নট নড়ন-চড়ন। একেবারে ঘাড়-মুখ গোঁজ করে সেই যে দাঁড়াল আর এগোবার নাম নেই। সায়েবরা নেমে পড়ল ফার্স্ট ক্লাস থেকে। নেটিভরাও নেমে এল হৈ হৈ করতে করতে। এগিয়ে এল একদল লোক। তারা এই গাড়িরই কর্মচারী। ঠেলেঠুলে কোনোমতে ঘোড়াজোড়াকে নড়ানো গেল। গাড়িও চলতে লাগল ঘড়ঘড় করে। পথের ধারে সার বেঁধে দাঁড়ানো লোকজনের মধ্যে অনেকেই কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল মা কালীর উদ্দেশ্যে সেদিনের ট্রাম-ট্রেনের নির্বিঘ্ন যাত্রা কামনা করে। সেদিনটা ছিল ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০। সেদিন এ-গাড়িকে লোকে বলত ট্রাম-ট্রেন। মালপত্র নিয়ে যাবার জন্যেই এই গাড়ির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা হয়েছিল শ'দেড়েক ওয়েলার ঘোড়া। বৈঠকখানার বাজারের কাছে ঘোড়ার আস্তাবলও তৈরি হয়েছিল।

আসলে কিন্তু এই ট্রাম বেশি দিন চলেনি। মাত্র ৯ মাস চলবার পর দেখা গেল, মাসে পাঁচশো টাকা লোকসান হয়ে যাচছে। সরকার তখন বিলেতের ডিলউইন পারিশ, আলফ্রেড পারিশ ও রবিনসন

সাউদারের কাছে বেচে দিলেন। এই তিন ইংরেজ পুরনো গাড়ি আর লাইন কিনে নিলেন চার হাজার টাকায়। শিয়ালদা থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত ট্রামের লাইন বসাতে সরকারের খরচ হয়েছিল দেড় লক্ষ

ঘোড়ায় টানা ট্রাম

টাকা। তিন ইংরেজ মিলে তৈরি করলেন ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি। লাইন বসানো হল শিয়ালদা—বৌবাজার, শিয়ালদা—বৌবাজার—ড্যালহৌসি—হেয়ার স্ট্রীট রুটে। বোম্বাইয়ে তখন ট্রাম চলছে নিয়মিত।

নতুন কোম্পানির প্রথম গাড়ি চলে ছিল ১৮৮০ সালের ১ নবেম্বর শিয়ালদা—বৌবাজার লাইনে। কিন্তু লোকজনের দারুন ভয়। ট্রামে উঠলে ট্রাম যদি ছিটকে লাইনের বাইরে চলে যায়। রবিনসন সায়েব তখন টাউন কাউন্সিলের সদস্যদের ট্রামে চাপিয়ে নিয়ে গেলেন বৈঠক-খানার আস্তাবলের সামনের রাস্তা পর্যন্ত। আস্তে আস্তে ভয় ভাঙল মানুষের। ট্রামে ভিড় শুরু হল। ১৮৮৪ সালের মধ্যেই চিৎপুর, চৌরঙ্গি, ধর্মতলা, খিদিরপুর, শ্যামবাজার আর ওয়েলেসলির রুটে ট্রাম চলাচল শুরু হল। এর আগে ১৮৮২ সালে ঘোড়ার বদলে স্টীম ইঞ্জিন দিয়ে ট্রাম চালাবার চেষ্টা হয়। চৌরঙ্গি লাইনে স্টীম ইঞ্জিন দিয়ে ট্রাম চালানো হল পরীক্ষামূলকভাবে। কিন্তু সুবিধে হল না। কয়েকদিনের

মধ্যেই বেশ কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটল। তাছাড়া চৌরঙ্গির সৌখিন সায়েবরা বললেন—এই বিকট আওয়াজ আমাদের কাছে অসহ্য। এটা বন্ধ কর। তাই এগারো মাস চলার পর স্টীম ইঞ্জিন বন্ধ হল শুধু ঘোড়ায় টানতে লাগল ট্রাম।

প্রথম থেকেই কিন্তু ট্রামে শ্রেণীবিভাগ ছিল, যদিও তখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য আলাদা বগি ছিল না। সামনের প্রথম দুই সারি গদিমোড়া বসবার যায়গা ছিল প্রথম শ্রেণী—ভাড়া তখনকার দিনেব ছ'পয়সা। পেছনের দিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া লাগত চার পয়সা। দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য আলাদা বগি প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা কিছু কিছু লোকের তরফ থেকে তখনই শুরু হয়।

১৯০২ সালে বিদ্যুৎ এল। বছর তিনেকের মধ্যেই সমস্ত রুট থেকে ঘোড়াদের বিদায় দেওয়া হল। বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন চালু হল সব রুটে।
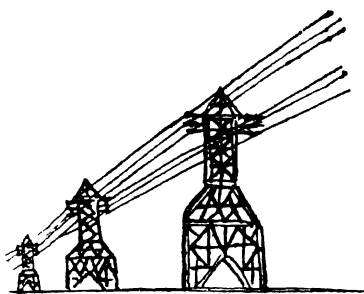
বিদ্যুৎ

'বোতাম টিপলেই আলো জ্বলবে। তেল লাগেনা, গ্যাস লাগেনা, নির্ঝঞ্ঝাট নিরুপদ্রব ব্যবস্থা। কলকাতা শহরে এবার আলোর বন্যা বইয়ে দেব আমরা। নামমাত্র খরচে রাতকে দিন করে দেবার আয়োজন হয়েছে।' ডালহৌসি স্কোয়ার আর এসপ্লানেডের রাস্তায় ঠেলাগাড়ি আর ঘোড়ার গাড়িতে রঙচঙে পোস্টার লাগিয়ে কলকাতায় প্রথম বিদ্যুৎ আগমনের খবর এইভাবে প্রচার করা হত। রাস্তার লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবত এ আবার কি জিনিস।

বিদ্যুৎ কিন্তু একদিন সত্যি সত্যিই কলকাতায় এল। দিনটা ছিল ১৮৯৯ সালের ১৭ এপ্রিল। তার আগে ১৮৯৮ সালের ৬ ডিসেম্বরের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় যে খবর বেরুল তা এই রকম—'ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে কলকাতা শহরে বিদ্যুতের আলো চালু করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদের এজেন্ট হল মেসার্স কিলবার্ণ অ্যাণ্ড কোম্পানি। বিদ্যুতের আলোর জন্যে কর্পোরেশন এক লক্ষ স্টার্লিং পাউণ্ড ব্যয় করবে। ষাট হাজার ল্যাম্পের জন্যে মেইন বসানো হয়েছে। ল্যাম্পের সংখ্যা দু'লক্ষ পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে। আপার ও লোয়ার সার্কুলার রোড, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ও চিৎপুর অঞ্চলে আলোর ব্যবস্থা করা হবে। আপাতত ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, আপার ও লোয়ার চিৎপুর রোড, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গি রোড, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, উড ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, বহুবাজার ষ্ট্রীট, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট, পার্ক ষ্ট্রীটের একাংশ, রাসেল ষ্ট্রীট ও লাউডন ষ্ট্রীটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। সমস্ত দিনরাত্রি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। পাখা

চালাবার পক্ষে এই বিদ্যুৎ অত্যন্ত কার্যকর হবে। এতে পাখার কুলির বেতন অপেক্ষাও খরচ কম। মূল কেন্দ্রটি ইমাম বাগ লেনে। সেই কেন্দ্রে ৫০০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট তিনটি বয়লার আছে। প্রয়োজনে সেই বয়লারকে ৮০০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট করা যাবে ৮টি ডায়নামো ও একটি স্টোরেজ ব্যাটারির যাহায্যে। এখানকার বিদ্যুতের মূল্য লণ্ডন সহরের বিদ্যুতের মূল্যের সমান হবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনিটি কলকাতার মধ্যে সর্বোচ্চ—জল সরবরাহ কেন্দ্রের চিমনি অপেক্ষা ৪০ ফুট বেশি উঁচু। জানুয়ারির মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু তার আগেই কোম্পানি বেঙ্গল ক্লাব, ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল এবং বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির বসত বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করেছেন।'

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার খবরে উল্লেখিত 'বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিব' মধ্যে একজন ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পবিবারের গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্র নাথের মেয়ে পূর্ণিমা দেবী লিখেছেনঃ "যখন কলকাতায় ইলেকট্রিক আসে তখন শহরের বড়লোকেরা বাড়িতে ইলেকট্রিক নিতে ভয় পান। লোকে ভাবত বাড়ি ছেঁদা করে আনতে হবে, তারপর হয়ত শক্ লাগতে পারে, থাকগে নিয়ে কাজ নেই। বাবাই প্রথমে বাড়িতে ইলেকট্রিক আনলেন। তাই দেখে সকলের সাহস হয়। বোধহয় ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির বিজ্ঞাপনের কাজ হয়েছিল বলে বাবাকে টাকা দিতে হয়নি। নতুন জিনিসের প্রতি বাবার ভীষণ ঝোঁক ছিল।"

১৮৯৫ সালে বিদ্যুৎ সরবরাহ আইন পাশ হবার পর ১৮৯৭ সালের ৭ জানুয়ারি তাড়াহুড়ো করে গঠন করা হয় 'দি ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড'। এই কোম্পানিই তাদের এজেন্ট কিলবার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানির মাধ্যমে কলকাতা শহরের ১৪ বর্গ কিলোমিটারের কিছু বেশি জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লাইসেন্স পায়। মাসখানেক পরে কোম্পানির এক বিশেষ বৈঠকে কোম্পানির নাম বদলে রাখা হয় 'দি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড'। কোম্পানির

মূলধন সংগ্রহের জন্যে বাজারে এক লক্ষ পাউণ্ডের কাগজ ছাড়া হলে একদিনেই তা বিক্রি হয়ে যায়।

কোম্পানির প্রথম এক হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয় পাঁচ নম্বর ইমাম বাগ লেনে, যার এখনকার নাম প্রিন্সেপ স্ট্রীট। এই কেন্দ্রের জন্যে আনা হয় ব্যাবকক উইলকক্স বয়লার, উইলিয়ামস্-এর স্টীম ইঞ্জিন আর ৪৫০।২২৫ ভোল্টের ক্যাম্পটন ডায়নামো। প্রথমে মাটির নীচে আর ওপরে দুরকম লাইনই বসানো হল। ঘনবসতি এলাকায় লাইন গেল মাটির তলা দিয়ে। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল আলো আর জ্বলছে না। লাইন পরীক্ষার জন্যে মাটি খুঁড়তেই দেখা গেল উইপোকায় সব তার কেটে তছনছ করে দিয়েছে। তখন থেকেই ইটের গাঁথনি আর পোর্সিলিনের ব্রীজ দিয়ে ঢাকা তারের ব্যবস্থা চালু হল।

প্রথম প্রথম লোকে বাড়িতে লাইট নিতে ভয় পেত। কিন্তু দু' একজনের দেখা দেখি ক্রমশ সকলেই লাইট নিতে আরম্ভ করল। চাহিদা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আলিপুর, হাওড়া, উল্টোডাঙায় নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হল। ১৯০২ সাল থেকে ঘোড়ায় টানা ট্রাম বিদায় নিল। এল বিদ্যুতের ট্রাম। এরপর এল বৈদ্যুতিক পাখা। কাঠের ব্লেড লাগানো। বিদ্যুৎ আসার সঙ্গে সঙ্গে চটকল গড়ে উঠতে লাগল একের পর এক। ১৯১২ সালে বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়র স্যার এডোয়ার্ড কেনেডির পরামর্শে তৈরি হল কলকাতায় প্রথম এসি. বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এরপর ১৯২৬ সালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র হল মেটেবুরুজে। ১৯৩১ সালে হাওড়া আর কলকাতার মধ্যে বৈদ্যুতিক যোগাযোগের জন্যে গঙ্গার তলা দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ করা হয়।

বিদ্যুৎ আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগ থেকে আর একটা যুগের দিকে পা বাড়াল কলকাতা। শহর তখন মহানগর হবার পথে পা বাড়াচ্ছে বিদ্যুত গতিতে। কালে কালে সেদিনের গ্রাম কলিকাতা রূপান্তরিত হতে লাগল এযুগের মহানগর কলকাতায়।
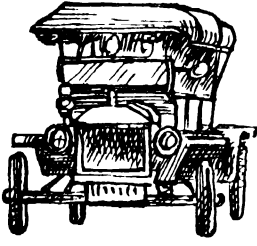
মোটর

আটাত্তর বছর আগের কলকাতা। চৌরঙ্গি অঞ্চলে তখন অনেক ফাঁকা। রাস্তাঘাটও নতুন। ১৯০৩ সালে একদিন লোকজন অবাক হয়ে দেখল একটা অদ্ভুত জিনিস বেশ জোরে ছুটে চলেছে ধর্মতলার দিকে। একটা গাড়ি। কিন্তু তাতে চারটে চাকা লাগানো। সম্পূর্ণ ঢাকা। ভেতরে সামনেব আসনে বসে এক সাহেব একটা চাকার মত কী যেন ঘোরাচ্ছে। ঘরঘর আওয়াজ করতে করতে গাড়িটা ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে পোঁ পোঁ করে হর্ণ বাজছে। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বিজ্ঞের মত বললেন, 'এর নাম মটর গাড়ি। এটা হাওয়ায় চলে। বিলেত থেকে এয়েচে।'

১৮৯৫ সালে ফ্রান্সের ডেইমলার মোটর কোম্পানির প্রতিনিধি কলকাতায় এসে ম্যাজিক লণ্ঠনে রঙীন ছবি দেখিয়ে মোটরের নানারকম সুবিধের কথা বুঝিয়ে দিলেন। এর পরের বছরে অর্থাৎ ১৮৯৬ সালে কলকাতার পথে প্রথম মোটর দেখা গেল প্রাথমিক অবস্থায়।

প্রথম দিকে মোটরের ইঞ্জিন, টায়ার সবকিছুই আসত বিলেত থেকে। এখানে বিখ্যাত গাড়িওয়ালা স্টুয়ার্ট আর ডাইকস্ সেই সব জিনিস দিয়ে ঘোড়ার গাড়ির নকসায় মোটরের বডি তৈরী করত।

১৯২৫ সালে সারাভারতে মোটর ছিল তিরিশ হাজার। এর মধ্যে বেশির ভাগই ব্যাক্তিগত গাড়ি।

১৯০৫ সালে ৮ ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট এক সিলিণ্ডারের একটা রোভার গাড়ির দাম ছিল ছত্রিশশো টাকা।

১৯০৭ সালে কলকাতায় ভারতের প্রথম মোটর প্রদর্শনী লেডি মিণ্টো মোটর একজিবিশন হয়।

১৯০৫ সালের একটা বিজ্ঞাপনে কলকাতায় মোটরকে জনপ্রিয় করবার জন্যে ঘণ্টায় ৩৫ মাইল গতিসম্পন্ন সাত ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট
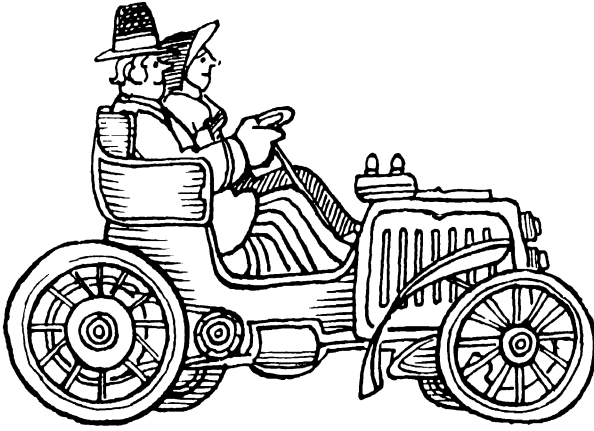
ওল্ডস মোবাইল আর উলস্লি গাড়ি হায়ার পারচেজ পদ্ধতিতে বিক্রির কথা জানা যায়। ১৯০৯ সালে ভারতে মোটরগাড়ি আর মোটর সাইকেল আমদানী হয়েছিল তিনলক্ষ দশহাজার পাউণ্ডের।

কলকাতায় বাস চালানোর কাজে উদ্যোগনেয় দু'টি কোম্পানি—অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মোটর ক্যাব কোম্পানি আর মেসার্স ব্র্যানডেলস্ কোম্পানি। ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হল অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল। এই অ্যাসোসিয়েশন ১৯০৮ সালে কলকাতায় বাস চালাননি, চালিয়েছিলেন ট্যাক্সি। খুব মজার কথা—তখন গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে ছিল কলকাতার একমাত্র ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। কলকাতায় নিয়মিত বাস চলতে সুরু করে ১৯২৩ সালে। প্রথম বাস চলেছিল আপার সার্কুলার রোড দিয়ে। কোন বিদেশী কোম্পানি কিন্তু বাস চালায়নি। বাস চালিয়েছিলেন একজন মুসলমান ব্যবসায়ী আবদুল শোভান। শ্যামবাজার-কলেজ স্ট্রীট বৌবাজার-ড্যালহৌসি রুটে প্রথম বাস চালায় ওয়াল ফোর্ড কোম্পানি।

বারোয়ারি পুজো

দুর্গাপুজোর প্রবর্তন আকবরের আমলে। নদীয়া জেলার তাহির-পুরের কংসনারায়ণ প্রথম মাটির মূর্তি পুজো শুরু করেন। তারপর থেকে বাড়ির পুজো হিসেবে চলে এসেছে দুর্গাপুজো। ১৭৯০ সালে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার বারোজন ব্রাহ্মণ মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন জনগণের জন্যে একটা পুজো হওয়া দরকার। এ জন্যে জনগণের কাছ থেকেই সাহায্য নিয়ে তাদের সহযোগিতায় পুজো হবে। শুরু হল বারোয়ারি। বারো ইয়ার থেকে বারোয়ারি। বারোয়ারি শুরু হতেই হৈ-হৈ পড়ে গেল সারা বাংলাদেশে। গুপ্তিপাড়া থেকে বারোয়ারি ক্রমশ এল শান্তিপুর, উলো, কাঁচরাপাড়া, চুঁচুড়ায়। হুতোম বলেছেন—'শান্তিপুরের বারোয়ারিতে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ, সাত বৎসর ধরে তার হুজুক চলে। প্রতিমা ষাট হাত উঁচু, বিসর্জনের সময় কেটে কেটে নদীস্থ করিতে হয়। কলকাতার বাবুরা চুঁচুড়ার বারোয়ারিতে 'আচাভোয়ার বোম্বাচাক' সঙ আদি দেখিতে বোট, বজরা ভাউলে চেপে যাইত। বারোয়ারি লইয়া টকরা-টকরিতে বিলক্ষণ অর্থ ব্যয় হইত।'

কলকাতায় নিয়ম মোতাবেক বারোয়ারি পুজোর শুরু অনেক পরে। আর কলকাতায় বারোয়ারির চেয়ে সার্বজনীন বা সর্বজনীন কথাটাই প্রচলিত। এই সর্বজনীন শুরু ১৯২৬ সালে। সিমলা ব্যয়াম সমিতির পুজোই কলকাতার প্রথম 'অফিসিয়াল বারোয়ারি' পুজো। এর পরের বছর থেকে শুরু হয় বাগবাজার সর্বজনীন পুজো। কিন্তু এর অনেক আগেও চাঁদা তুলে পুজো করার রেওয়াজ ছিল। বেহালার সাবর্ণ চৌধুরীদের বারোয়ারিতলা থেকেই বোঝা যায় বারোয়ারি পুজো নাম তখনো ছিল। চৌধুরী বাড়ির ছেলেরা দল বেঁধে চাঁদা তুলত। চাঁদার

জুলুমও হত। ১৮৪০ সালে চব্বিশ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট প্যাটন সাহেব নিজে ছদ্মবেশে পাল্কী চেপে গিয়ে চৌধুরী বাড়ির বারোয়ারিতলায় ছেলেদের চাঁদা তোলার জুলুম বন্ধ করেছিলেন। কলকাতাতে তখনও বারোয়াবি ব্যাপার চলত। 'জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁর গদীতে উহার জন্য বড় ধুমধাম হইত। তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়া কলকাতাব ধনী ও ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে বারোয়ারি বৃত্তি লইয়া পুজা কবিতেন।'

সেকালের সংবাদপত্রের খবর—"১লা অক্টোবর ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বৈঠকখানার বাজারে দুর্গাপূজার বিসর্জন ও মহরমের উৎসব একদিন পড়ায় হইয়াছিল। সেই ব্যাপাবে মুসলমানেরা যেমন হিন্দুব প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলে তেমনি হিন্দুরা মুসলমানগণের তাজিয়া চূর্ণ করে। সেই দাঙ্গায় মুসলমানেরা কোম্পানির বেনিয়ান রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রবধূকে সাংঘাতিক আহত এবং বহুবাজারের সুখময় ঠাকুবের বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গোহত্যা ও লুঠপাট করে।' পরে শোনা যায় সেই সব লুঠের মালপত্র নাকি ওয়ারেন হেস্টিংস-এব তৈরী এক মাদ্রাসায় পাওয়া গিয়েছিল।

১৮৪০ সালে বিলিতি সরকারের দশ নম্বরী আইন পাস হওয়ার আগে পর্যন্ত কলকাতার দুর্গাপুজো ছিল সাদা কালো নির্বিচারে সকলেরই সামাজিক উৎসব। সেই সমাজে কলকাতার বাবুরা বাড়িতে দুর্গাপুজো করতেন প্রধানত সায়েবদের নেমন্তন্ন করে তুষ্ট করার জন্যে। শুধু কলকাতা কেন, বাংলার অন্যান্য জায়গাতেও এই ধরনের পুজো হত। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এর উজ্জ্বল নিদর্শন। কৃষ্ণচন্দ্র ১৭২৮ সালে সর্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন। ১৮২৯ সালের ১৭ অক্টোবর সমাচার দর্পণের মন্তব্য—'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথমত এই উৎসবে বড় জাঁকজমক করেন এবং তাঁহার ঐ ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে ক্রমে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের আমলে যাঁহারা ধনশালী হইলেন তাঁহারা আপনাদের দেশাধিপতির সমক্ষে ধনসম্পত্তি দর্শাইতে পূর্বমত ভীত না হওয়াতে

তদ্দৃষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা ব্যয় করিতেছেন।' কলকাতার দুর্গাপুজোর আড়ম্বরের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরত। এর কারণ সায়েব-মেমরা পুজো বাড়িতে যেতেন, প্রসাদ খেতেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণামও করতেন। পাথুরিয়াঘাটার রামলোচন ঘোষের বাড়ির পুজোয় হেস্টিংস-এর পত্নী নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। কুমোরটুলির গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ির পুজো প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দুর্গোপুজোয় খরচ করেছিলেন বারো লক্ষ টাকা। সেটা ১৭৬০ সাল। নবকৃষ্ণের 'পরম সুহৃদ' রবার্ট ক্লাইভ রাজবাড়িতে এসে 'গডেস ডুরগার' সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতেন। 'কলিকাতার বহুবাজার, বাগবাজার কাঁসারিপাড়া, জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে পুজোর সময় সখের গান বাজনার বৈঠক বসিত। এতদ্ভিন্ন গঙ্গার উপর ঠাকুর বিসর্জন নৌকা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তদুপরি নাচ-তামাসা হইত। শ্রীশ্রী৺পূজার সময়ে যে প্রকার ঘটা কলকাতায় হইত এক্ষণে তাহার ন্যুন হইয়াছে। কেননা বাবু গোপীনাথ ঠাকুর ও মহারাজা সুখময় রায়বাহাদুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিক প্রভৃতি ইহারা পূজার সময় নাচ তামাসাদির অত্যন্ত বাহুল্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের বাটীর সম্মুখে রাস্তায় প্রায় পুজার তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমন হওয়া ভার ছিল। শেষে ক্রমে ক্রমে উক্ত মহাশয়েরা ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু শোভাবাজারের রাজবাটীতে এবং জোড়াসাঁকো সিংহ বাবুদিগের বাটীতে প্রতি বৎসর নাচ হইয়া থাকে' [চন্দ্রিকা : ১৩ই অক্টোবর, ১৮৩২]।

বাড়ির পুজো হিসেবে বিখ্যাত ছিল উত্তর কলকাতার ঘোষ লেনের গিরীশচন্দ্র ঘোষের বাড়ির পুজো, হাটখোলা দত্তবাড়ি, চোরবাগানের চ্যাটার্জী বাড়ি, সাবর্ণ চৌধুরীর বাড়ি, ভূকৈলাশের রাজবাড়ি ও আরো অনেক নামী বাড়ির পুজো। পুজোর খরচ? ১৭২২ সালের একটা হিসেবের খাতা থেকেই বোঝা যায় বাজার দর কেমন ছিল। সওয়া

মণ গাওয়া ঘি—২৭ টাকা, সওয়া মণ চিনি—৯ টাকা সাড়ে চারআনা, সওয়া মণ বালাম চাল—পাঁচ সিকে, ভাল অড়হড় ডাল সওয়া মণ পাঁচ

সিকে। খুব জাঁকজমক করে পূজো করলেও খরচ হত হাজারখানেক কি হাজার দুয়েক টাকা।

সেকালের কলকাতা তথা বাংলাদেশে সায়েবরাও দুর্গাপুজোয় অংশ গ্রহণ করতেন সক্রিয়ভাবে। কোম্পানির অডিটর জেনারেল জন চিপস বীরভূমে কোম্পানির কমার্শিয়াল এজেন্ট হিসেবে এসে সুরুতে কোম্পানির কুঠিতে বেশ ধূমধামের সঙ্গে পুজো করেন। ১৮২৯ সালে বঙ্গদূত পত্রিকায় লেখা হয়—মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুই বাটীতে নবমীর রাত্রে শ্রীশ্রীযুক্ত গবনর জেনারেল লার্ড বেন্টিক বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীশ্রীযুক্ত লার্ড কাম্বরমীর ও প্রধান প্রধান সাহেব লোক আগমন করিয়াছিলেন।' হিন্দুদের দুর্গাপূজায় সায়েবরা কামান থেকে তোপ দাগত। গোরা সিপাহীরা এসে স্যালুট দিয়ে শ্রদ্ধা জানাত দেবী দুর্গাকে। ১৮৪০ সালে সায়েবরা আইন করল—এদেশের পুজো আর অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে তারা আর থাকবে না। আর তখন থেকেই বাড়ির পুজোর উৎসবে ভাঁটা পড়তে শুরু করল। নিকির নাচ, সুপনাজানের

গান আর নিতে-ভবানীর কবির লড়াই বন্ধ হয়ে গেল পুজো মণ্ডপে। ক্রমশ কমে আসতে লাগল আড়ম্বরের জোয়ার। শুধু কিছু শর্টকাট পদ্ধতির হৈ-হুল্লোড় থেকে গেল বারোয়ারির মণ্ডপে। পরবর্তীকালে এইসব মণ্ডপই রূপ নিল সর্বজনীন বা সার্বজনীন পুজোয়। গুপ্তিপাড়ার সেই বারো ইয়ারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পুজো এখন কলকাতার সর্বজনের পুজোয় রূপান্তরিত।

॥ তথ্যসূত্র ॥

১। কলিকাতার সেকাল ও একাল : হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

২। প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় : হরিহর শেঠ

৩। Good old days of Honourabler John Company : W. H. Carey

৪। কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত : বিনয় ঘোষ

৫। Calcutta Past and Present : Kathleen Blechynden

৬। উনিশ শতকের বাংলা : যোগেশ চন্দ্র বাগল

৭। সেকাল ও একাল : রাজনারায়ণ বসু

৮। সংবাদপত্রে সেকালের কথা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯। কলিকাতার কথা : প্রমথ নাথ মল্লিক

১০। History of Bengal : Stewert.

১১। Calcutta : India's City : Ashok Mitra.

১২। Calcutta during last Century : H. Blochman.

১৩। Selections from Calcutta Gazette.

১৪। ভারতবর্ষ পত্রিকা

১৫। ঠাকুরবাড়ির গগন ঠাকুর : পূর্ণিমা দেবী

১৬। She Statesman.

১৭। Calcutta old and New : Cotton.

১৮। সমাচার দর্পন

১৯। সমাচার চন্দ্রিকা